অন্ত্য-লীলা

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষ্যোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতম্
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে ॥ ১

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী-দিবস-কৃষ্ণবিরহবিহ্বলে ॥ ২

স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজনার সনে।
রাত্রি-দিনে রসগীত শ্লোক-আস্বাদনে ॥ ৩

নানা ভাবে উঠে প্রভুর—হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্যোদ্বেগ আর্ত্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ ॥ ৪

সেই-সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্রেমেতি। গৌরচন্দ্রস্য লপিতং প্রলাপাদিকং ভাগ্যবদ্ভিঃ সাধুভিঃ কর্ত্তৃভূতৈঃ নিষেব্যতে শ্রূয়তে ইত্যর্থঃ। কথম্ভূতং লপিতম্? প্রেমোদ্ভাবিতং প্রেম্ণোঽভ্যুদ্ভূতং হর্ষং আনন্দং ঈর্ষ্যা গুণেষু দোষারোপণং উদ্বেগং ইতস্ততো ধাবনং দৈন্যং দীনতা আর্ত্তিং মনঃপীড়া এতৈ র্মিশ্রিতম্। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক স্বরচিত-শিক্ষাষ্টক-শ্লোকের অর্থাস্বাদন এবং তৎ-প্রসঙ্গে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য বর্ণন ও প্রলাপাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। প্রেমোদ্ভাবিত-হর্ষের্ষ্যোদ্বেগদৈন্যার্ত্তি-মিশ্রিতং (প্রেমজনিত হর্ষ, ঈর্ষ্যা, উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্ত্তি মিশ্রিত) গৌরচন্দ্রস্য (শ্রীগৌরাঙ্গের) লপিতং (প্রলাপ বাক্য) ভাগ্যবদ্ভিঃ (ভাগ্যবান্ জনগণকর্ত্তৃকই) নিষেব্যতে (শ্রুত হইয়া থাকে)।

অনুবাদ। প্রেমজনিত হর্ষ, ঈর্ষ্যা, উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্ত্তি মিশ্রিত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রলাপ-বাক্য ভাগ্যবান্-জনগণই শ্রবণ করিয়া থাকেন। ১

পরবর্ত্তী ৫ ও ৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। **রসগীত**—ব্রজরস সম্বন্ধীয় গীত। **শ্লোক**—ব্রজরসসম্বন্ধীয় শ্লোক।

৪। **হর্ষ**—অভীষ্ট বস্তুর দর্শনে বা লাভে চিত্তের যে প্রসন্নতা জন্মে, তাহার নাম হর্ষ। "অভীষ্টেক্ষণলাভাদিজাতা চেতঃ প্রসন্নতা। হর্ষঃ স্যাৎ ॥—ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৪।১৮॥" **শোক**—ইষ্টবিয়োগের অনুচিন্তনকে শোক বলে। **রোষ**—ক্রোধ। **দৈন্য**—২।২।৩২ টীকা দ্রষ্টব্য। **উদ্বেগ**—৩।১৭।৪৬ টীকা দ্রষ্টব্য। **আর্ত্তি**—কাতরতা। **উৎকণ্ঠা**—ইষ্টলাভে কালক্ষেপের অসহিষ্ণুতা। **সন্তোষ**—তৃপ্তি।

৫। **সেই-সেই ভাবে**—হর্ষ-শোকাদির ভাবে। **নিজ শ্লোক**—প্রভুর স্বরচিত শ্লোক। শিক্ষাষ্টকাদি। **দুই বন্ধু**—স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দ।

কোনদিনে কোনভাবে শ্লোকপঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি-জাগরণ ॥ ৬

হর্ষে প্রভু কহে—শুন স্বরূপ রামরায়!।
নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই পরিচ্ছেদের আরম্ভ-শ্লোকে বলা হইয়াছে, প্রেমোদ্ভাবিত হর্ষ-ঈর্ষ্যাদির বশীভূত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে যে প্রলাপবাক্য বলিয়াছেন, তাহাই এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে; বর্ত্তমান পয়ারেও বলা হইল, সেই সেই (হর্ষ ঈর্ষ্যাদি) ভাবের বশেই তিনি স্বরচিত শিক্ষাষ্টক-শ্লোকাদি পাঠ করিলেন।

৭। **হর্ষে**—হর্ষ-ভাবের উদয়ে। **কলৌ**—কলিযুগে। **পরম উপায়**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

হর্ষভাবের উদয়ে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রায় রামানন্দ ও স্বরূপদামোদরকে বলিলেন, কলিযুগে শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। (পরবর্ত্তী "কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোক ইহার প্রমাণ।)

এস্থলে একটী কথা বিবেচ্য। এই প্রকরণের প্রথমেই বলা হইয়াছে, "এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে। রজনী-দিবস কৃষ্ণ-বিরহ-বিহ্বলে।" ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রাধা-ভাবে আবিষ্ট হইয়াই শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিহ্বল হইয়াছিলেন। এই বিরহের অবস্থায় হর্ষ-ভাবের উদয় কিরূপে সম্ভব হয়? আবার, নামসঙ্কীর্ত্তন-সম্বন্ধে প্রভু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পড়িলেও বুঝা যায় যে, তিনি ভক্তভাবেই ঐ সকল কথা বলিয়াছেন—কারণ, "সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন," "আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ", "খাইতে শুইতে যথা-তথা নাম লয়। কাল-দেশ-নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"—ইত্যাদি বাক্য ভক্ত-ভাবের বাক্য বলিয়াই মনে হয়। অথচ এই সমস্ত বাক্যকেই প্রারম্ভ-শ্লোকে "লপিতং গৌরচন্দ্রস্য—গৌরচন্দ্রের প্রলাপ বা বিলাপ" বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, এই সমস্ত বাক্য প্রভুর দিব্যোন্মাদ-অবস্থাতেই স্ফুরিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, দিব্যোন্মাদে ভক্তভাব কিরূপে সম্ভব হয়? আমাদের মনে হয়, উদ্‌ঘূর্ণাবশতঃই প্রভুর এই ভক্ত-ভাব। উদ্‌ঘূর্ণাবশতঃ শ্রীরাধা যেমন সময় সময় নিজেকে ললিতাদি মনে করেন, রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুও যেমন জলকেলি-আদির প্রলাপে নিজেকে সেবা-পরা-মঞ্জরীরূপে মনে করিয়াছেন, এস্থলেও তদ্রূপ উদ্‌ঘূর্ণাবশতঃ রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু নিজেকে ভক্ত মনে করিতেছেন। বিরহ-স্ফুরণে শ্রীকৃষ্ণের কথা, শ্রীকৃষ্ণের সেবার কথা ভাবিতে ভাবিতে ব্যাকুল হইয়া প্রভু হয়তো মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার যেন কখনই শ্রীকৃষ্ণ-সেবার সৌভাগ্য হয় নাই; (ইহা গাঢ় অনুরাগের লক্ষণ); ইহার সঙ্গে সঙ্গেই, কিভাবে সেই সেবা পাইতে পারেন—তদ্বিষয়েই সম্ভবতঃ প্রভুর চিত্তবৃত্তি নিবিষ্ট হইয়াছিল; তাহার ফলেই সম্ভবতঃ ভক্তভাবের স্ফুরণ।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নর-লীলাপরায়ণ বলিয়া লীলানুরোধে সময় সময় তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাদি ঐশ্বর্য্য প্রচ্ছন্ন থাকিলেও, কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করে না; তাঁহার ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে তাঁহার প্রচ্ছন্ন ঐশ্বর্য্য-শক্তি সকল সময়েই তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। উদ্‌ঘূর্ণাজনিত ভক্তভাবে প্রভু যখন কৃষ্ণ-সেবাপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতেই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি তাঁহার চিত্তে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের কথা এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যের কথা স্ফুরিত করিয়া দিল। আনন্দ-স্বরূপ নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যাদির স্ফুরণেই বোধহয় প্রভুর হর্ষভাবের উদয় হইয়াছিল। এই হর্ষের আবেশে প্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন।

প্রভু বলিলেন, কলিতে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু কিসের উপায়? ব্যবহারিক জগতে দেখা যায়, আমরা যখন কোনও বিপদে পতিত হই, তখন সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য উপায়ের অনুসন্ধান করি। বিপদে পতিত না হইলেও, কোনও লোভনীয় বস্তুর কথা শুনিলে, তাহা পাওয়ার জন্যও উপায়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকি। অথবা, যদি বিপদেও পতিত হই এবং সেই বিপন্ন অবস্থাতেই যদি কোনও লোভনীয় বস্তুর কথা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শুনি, তাহা হইলে বিপদ হইতে মুক্তিলাভের এবং সেই লোভনীয় বস্তুটী প্রাপ্তির জন্যও উপায়ের অনুসন্ধান করা হয়। কোন্ বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার, বা কোন্ লোভনীয় বস্তুটী পাওয়ার উপায়ের কথা কলির জীবকে প্রভু জানাইতেছেন?

প্রভু কলির জীবের জন্য উপায়ের ব্যবস্থা করিতেছেন; একজন দুই জনের জন্য নয়; সমস্ত কলিজীবের জন্য—"কলৌ"-শব্দ হইতেই তাহা ধ্বনিত হইতেছে। কলির সমস্ত জীব কোন্ এক সাধারণ বিপদে পড়িয়াছে বা কোন্ এক সাধারণ লোভনীয় বস্তুর জন্য লুব্ধ হইয়াছে? সাধারণ লোক ইহার কোনওটাই জানে না। এই মাত্র জানে যে—সংসারে আমাদের দুঃখ-দৈন্য আছে, জরা-ব্যাধি আছে, শোক-তাপ আছে ও জন্ম-মৃত্যু আছে; আর আছে—সুখের বাসনা। সুখের জন্য নানাবিধ চেষ্টা আমরা করিয়া থাকি এবং মাঝে মাঝে কিছু সুখ পাইয়াও থাকি। প্রভু ইঙ্গিতে জানাইতেছেন—জীব, সংসারে তোমার দুঃখ-দৈন্য, জরা-ব্যাধি, কি বৈষয়িক বিপদ আদির পশ্চাতে একটী মহাবিপদ আছে; সেইটী হইতেছে ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাবশতঃ তোমার মায়াবন্ধন। এই সংসারে তোমার যত কিছু দুঃখ-দৈন্যাদি বিপদ, সমস্তই সেই মায়াবন্ধন হইতে উদ্ভূত। এই মায়াবন্ধনই সমস্ত সংসারী জীবের এক সাধারণ বিপদ। এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে নাম-সঙ্কীর্ত্তন। আর, সুখের কথা যদি বল, তাহাও বলি শুন। সুখের জন্য বাসনা জীবমাত্রেরই আছে; সুখ-বাসনার তাড়নাতেই জীব যত কিছু কার্য্য করিয়া থাকে। জীব মনে করে, সে মাঝে মাঝে সুখ পায়। কিন্তু যে সুখের জন্য তাহার চিরন্তনী বাসনা, তাহা সে-সুখ নয়; অভীষ্ট সুখ নয় বলিয়াই যাহা পায়, তাহাতে তাহার সুখের জন্য দৌড়াদৌড়ি-ছুটাছুটির অবসান হয় না, দুঃখ-নিবৃত্তিও হয় না; জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম, জন্ম হইলেই আধি-ব্যাধি লাগিয়াই আছে। রস-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তুর জন্যই বাস্তবিক জীবের চিরন্তনী বাসনা। যে পর্য্যন্ত সেই রস-স্বরূপ বস্তুটীকে পাওয়া না যাইবে, সেই পর্য্যন্ত সুখের জন্য তাহার ছুটাছুটীও বন্ধ হইবে না, তাহার জন্মমৃত্যুর অবসানও হইবে না। সেই রস-স্বরূপকে পাইলেই সুখের জন্য সমস্ত ছুটাছুটী বন্ধ হইবে, তখনই জীব বাস্তব সুখে সুখী হইতে পারিবে—আনন্দী হইতে পারিবে (১।১।৪-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রুতি একথাই বলেন—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" এই রস-স্বরূপ বস্তুকে পাইয়া আনন্দী হওয়ারও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে নাম-সঙ্কীর্ত্তন।

কিন্তু যে রস-স্বরূপ বস্তুটীকে পাইলে জীব আনন্দী হইতে পারে, সেই বস্তুটী কি? এবং তাঁহাকে কিরূপ ভাবে পাইলে জীব আনন্দী হইতে পারে?

শ্রুতি যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, আনন্দ বলিয়াছেন, তাঁহাকেই রসও বলিয়াছেন। "রসো বৈ সঃ।" সেই আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই পরম-আস্বাদ্য রস এবং পরম-আস্বাদক রস বা রসিকও (ভূমিকায় "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। গীতায় শ্রীকৃষ্ণকেই "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম" বলা হইয়াছে। তিনি আনন্দ-স্বরূপ, সুখ-স্বরূপ; আবার তিনিই "সুখরূপ হঞা করে সুখ-আস্বাদন।" এই রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইলেন "অশেষ-রসামৃত-বারিধি", তিনি মূর্ত্তিমান্ মাধুর্য্য, তাঁহার মাধুর্য্যদ্বারা তিনি "পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥", তিনি "আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত-হর॥" আবার তাঁহার একমাত্র ব্রত হইল—ভক্তচিত্ত-বিনোদন। তাই তিনি বলিয়াছেন—"মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥" ইনিই রস-স্বরূপ, রস-আস্বাদক; আবার রসের আস্বাদন করাইয়া ভক্তের চিত্ত-বিনোদনই তাঁহার একমাত্র ব্রত।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে এই রস-স্বরূপের কথাই বলা হইয়াছে। **"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতী॥**—রসং হি লব্ধ্বা এব আনন্দী ভবতি।" "হি" এবং "এব" এই দুইটী হইল নিশ্চয়াত্মক অব্যয়। "রসং হি"—এই রস-স্বরূপকেই পাইলে, অন্য কাহাকেও পাইলে নহে; ইহাই "রসং হি"-অংশের "হি"-শব্দের তাৎপর্য্য। এই রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে অনাদিকাল হইতে আত্ম-প্রকট করিয়া আছেন; তাঁহাতে অনন্ত-রস-বৈচিত্রী বিদ্যমান;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এসমস্ত রস-বৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপই হইলেন অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ ; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও তাঁহারই এক বৈচিত্রী বা স্বরূপ (ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্। গীতা)। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের বা অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের কোনও এক স্বরূপের প্রাপ্তিতেও জীব আনন্দী হইতে পারে বটে এবং আনুষঙ্গিক ভাবে মায়াবন্ধনজনিত তাহার দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিও হইতে পারে বটে ; কিন্তু তাহাতে জীব এমন আনন্দী হইতে পারিবে না, যাহাতে আনন্দের জন্য তাহার ছুটাছুটির সম্ভাবনা আত্যন্তিক ভাবে তিরোহিত হইতে পারে। একথা বলার হেতু এই। "মুক্তা অপি এনং উপাসত ইতি।" এই শ্রুতিবাক্য, "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" শ্রীভা, ১০৮৭।২১-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামি-ধৃত নৃসিংহতাপনীয় শঙ্কর-ভাষ্যের এই বাক্য, "আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্।"-এই ব্রহ্মসূত্র (৪।১।১২, গোবিন্দভাষ্য)-বাক্য হইতে জানা যায়, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য-প্রাপ্ত জীবেরও ভগবদ্-ভজনের প্রবৃত্তি হয়, ব্রহ্মানন্দের অনুভবেও জীব চরমা-পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। আবার সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া যাঁহারা পরব্যোমস্থিত বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছেন, অধিকতর সুখের আশায় তাঁহাদের অন্যত্র ছুটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলেও ছুটিয়া যাওয়ার বাসনা যেন আত্যন্তিক ভাবে দূরীভূত হয় না ; কারণ, তাঁহারা যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের পার্ষদ, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য তাঁহাদেরও বাসনা দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ ২।২১।৮৮ ॥ দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ইত্যাদি শ্রী, ভা, ১০।৮৯।৫৮ শ্লোক ॥ যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা চরত্তপ-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।১৬।৩৬ ॥"-এসকল শাস্ত্রবাক্যই তাহার প্রমাণ। কিন্তু অখিল-রসামৃত-বারিধি শ্রীকৃষ্ণের সেবা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অপর-স্বরূপের সেবার জন্য কোনও লোভের কথা শুনা যায় না। এমন কি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যদি কৌতুকবশতঃ বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের রূপ ধারণ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরদের মন যায়না (১।১৭।৯-শ্লোকে দ্রষ্টব্য)। এ সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে—রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই পাইলে জীব আনন্দী হইতে পারে, সুখের জন্য তাহার সমস্ত ছুটাছুটীর বাসনারও আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইতে পারে। ইহাই "হি"-অব্যয়ের তাৎপর্য্য।

আর "লব্ধ্বা এব"-এস্থলে "এব"-অব্যয়ের তাৎপর্য্য এই যে—সেই রসস্বরূপকে "পাইয়াই" জীব (অয়ং) আনন্দী হইতে পারে। "আনন্দী ভবতী"-বাক্যের আলোচনা করিলেই "লব্ধ্বা এব—পাইয়াই"-বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে, রস-স্বরূপকে কি ভাবে পাইলে জীব আনন্দী হইতে পারে, তাহাও বুঝা যাইবে। তাই, "আনন্দী ভবতি"-বাক্যের অর্থালোচনা করা যাইতেছে।

"আনন্দী ভবতি"-ইহা একটী শব্দও হইতে পারে, দুইটী (আনন্দী এবং ভবতি এই দুইটী) শব্দও হইতে পারে। একটি কি দুইটী শব্দ, তাহা দেখা যাউক।

একটী শব্দ হইলে সমস্ত "আনন্দীভবতি"-শব্দটীই হইবে ক্রিয়াপদ—আনন্দীভূ-ধাতুর প্রথম পুরুষের বর্ত্তমান-কালে একবচনান্ত ক্রিয়াপদ। "অয়ং—জীবঃ" হইবে ইহার কর্ত্তা। "কৃভ্বস্তিযোগে অভূত-তদ্ভাবে চিঃ"-ব্যাকরণের এই সূত্র অনুসারে, ভূ-ধাতুর যোগে আনন্দ-শব্দের উত্তর "চি" প্রত্যয় করিয়া "আনন্দীভূ"-ধাতু হইয়াছে ; তাহা হইতেই "আনন্দীভবতি।" অভূত-তদ্‌ভাবের অর্থ এই :—অভূতের (যাহা ছিল না) তদ্‌ভাব (তাহা হওয়া)। যাহা পূর্ব্বে শুক্ল ছিলনা, তাহা যদি পরে শুক্ল হয়, তাহা হইলে বলা হয়—শুক্লীভবতি। গোচরীভূত-শব্দের অর্থ এই যে—যাহা পূর্ব্বে গোচরে ছিলনা, তাহা এখন গোচরে আসিয়াছে। এইরূপে—"আনন্দীভবতি"-শব্দের অর্থ হইবে—যাহা পূর্ব্বে "আনন্দ" ছিলনা, তাহা এখন "আনন্দ" হইয়াছে (তাহা এখন "আনন্দী" হইয়াছে, এইরূপ অর্থ হইবে না ; যেহেতু, চি-প্রত্যয়ের অর্থ ইহা নহে)। তাহা হইলে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ হইবে এইরূপ :—(অয়ং) জীব পূর্ব্বে আনন্দ ছিলনা, রস-স্বরূপকে পাইয়া জীব "আনন্দ" হয়। রসও যাহা, আনন্দও তাহা, ব্রহ্মও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহা। তাহা হইলে "আনন্দীভবতি"কে একটী শব্দ ধরিয়া শ্রুতিবাক্যটীর যে অর্থ পাওয়া গেল, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই—রস-স্বরূপ বা আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকে পাইয়া জীব আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম হয়। কিন্তু ব্রহ্ম হইলেন বিভুচিৎ; আর ভক্তিশাস্ত্রানুসারে জীব হইল অণুচিৎ—ইহাই জীবের স্বরূপ (ভূমিকায় জীবতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অণু-চিৎ জীব কখনও বিভু-চিৎ ব্রহ্ম হইতে পারে না; যেহেতু, কোনও বস্তুরই স্বরূপের ব্যত্যয় হয় না, পরিমাণেরও ব্যতিক্রম হয় না। "অন্ত্যাবস্থিতেঃ চ উভয়নিত্যত্বাৎ অবিশেষঃ।"-এই (২।২।৩৬) বেদান্ত-সূত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে। "উভয়নিত্যত্বাৎ"—আত্মা এবং তাহার পরিমাণ এতদুভয়ই নিত্য বলিয়া "অন্ত্যাবস্থিতেঃ"—মোক্ষাবস্থায় অবস্থিত জীবাত্মার, "অবিশেষঃ"—বিশেষত্ব (পরিমাণ-বিষয়েও বিশেষত্ব) কিছু নাই; মোক্ষ-প্রাপ্তির পূর্ব্বে জড়দেহে অবস্থানকালে জীবাত্মার যে পরিমাণ থাকিবে, মোক্ষপ্রাপ্তির পরেও তাহার সেই পরিমাণই থাকিবে। সুতরাং জীব কখনও আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে পারে না; ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এইরূপে দেখা গেল, "আনন্দীভবতি"কে একটী মাত্র শব্দরূপে গ্রহণ করিলে ভক্তিশাস্ত্রানুসারে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের কোনও অর্থ সঙ্গতি থাকেনা।

মায়াবাদীদের মতে অর্থ-সঙ্গতি হয় কিনা, দেখা যাউক। মায়াবাদীদের মতে জীব হইল স্বরূপে ব্রহ্ম—আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম, আনন্দ। ইহাই যখন জীবের স্বরূপ, তখন রস-স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করার পূর্ব্বেও জীব আনন্দ, পরেও আনন্দ; জীব স্বরূপে কখনও আনন্দ ব্যতীত অপর কিছুই নহে; সুতরাং রস-স্বরূপকে লাভ করার পূর্ব্বে জীব যে আনন্দ ছিলনা, তাহা নহে। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে "অভূত-তদ্ভাব" হইতে পারেনা—জীব পূর্ব্বে আনন্দ ছিল না, রসস্বরূপকে পাইয়া আনন্দ হইয়াছে, একথা বলা যায় না। এইরূপে "অভূত-তদ্ভাবের" স্থানই যখন নাই, তখন "অভূত-তদ্ভাবার্থে চি"-প্রত্যয়ও হইতে পারে না; "আনন্দীভবতি"-একটী মাত্র শব্দও হইতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল—জীব-ব্রহ্মের একত্ব-বাদী মায়াবাদীদের মতেও "আনন্দীভবতি"-কে একটী মাত্র শব্দ মনে করিলে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের কোনও অর্থ-সঙ্গতি থাকে না।

তাই, "আনন্দী ভবতি"-একটী শব্দ নহে। "আনন্দী" এবং "ভবতি"-এই দুইটী শব্দ ধরিলে কি অর্থ হয়, দেখা যাউক।

আনন্দী ভবতি (হয়)—অর্থ, আনন্দী হয়। কিন্তু "আনন্দী"-শব্দের অর্থ কি? আনন্দ-শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ইন্ প্রত্যয় করিয়া আনন্দী-শব্দ নিষ্পন্ন হয়; যেমন, ধন-শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ইন্ প্রত্যয় করিয়া "ধনী"-শব্দ হয়, তদ্রূপ। অস্ত্যর্থের (অর্থাৎ অস্তি-অর্থের) তাৎপর্য্য হইল, আছে যাহার। যাঁহার ধন আছে, তিনি ধনী। "আছে"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—যাঁহার ধন আছে, ধনের যিনি মালিক, ধনে যাঁহার মমত্ব (ধন আমারই-এই বুদ্ধি) আছে, নিজের ইচ্ছামত ধন ব্যবহার করার অধিকার যাঁহার আছে, তিনিই ধনী। যিনি লক্ষ লক্ষ, কি কোটি কোটি টাকা নাড়াচাড়া করেন, অথচ তাহার একটী পয়সাও খরচ করার অধিকার যাঁহার নাই, তাঁহাকে ধনী বলে না; যেহেতু, ধনেতে তাঁহার মমত্ব নাই। ধনের মালিক তিনি নহেন। তদ্রূপ, আনন্দে বা আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মে যাঁহার মমত্ববুদ্ধি আছে, এই আনন্দ-স্বরূপ বা রসস্বরূপ ব্রহ্ম "আমারই", এইরূপ মদীয়তাময় ভাব যাঁহার আছে, তিনিই আনন্দী। "আনন্দ-স্বরূপ আমার"-এইরূপ ভাবের পরিবর্ত্তে, "আমি আনন্দ-স্বরূপের"-এইরূপ তদীয়তাময় ভাব যাঁহার আছে, তাঁহাকেও আনন্দী বলা যায় না। যিনি আনন্দকে নিতান্ত আপনার করিয়া পায়েন, তিনিই আনন্দী। শ্রুতিবাক্যের "লব্ধ্বা এব"-এর তাৎপর্য্য এই—যে ভাবে পাইলে নিতান্ত আপন করিয়া পাওয়া যায়, রস-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সেই ভাবে পাইলেই জীব আনন্দী হইতে পারে, তখনই আনন্দ লাভের জন্য তাহার সমস্ত ছুটাছুটীর অবসান হয়। ভক্তচিত্ত-বিনোদনই যাঁহার ব্রত, সেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্ম এবং রসিকেন্দ্র-শিরোমণি লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তখনই তাঁহাকে (সেই জীবকে) স্বীয় লীলায় সেবা দিয়া পরমানন্দ-সাগরে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত করিয়া কৃতার্থ করেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এইরূপ "আনন্দী" হওয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন, ইহাই প্রভু জানাইলেন।

পরম উপায়—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলা হইয়াছে। কেন একথা বলা হইল, এস্থলে তাহা আলোচিত হইতেছে।

(ক) যে সকল সাধন-পন্থা সাধক-সমাজে প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকটীর উপরেই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের **ব্যাপ্তি** আছে।

যাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ চাহেন, তাঁহারা কর্ম্মমার্গের অনুসরণ করেন; তাঁহাদের মায়াবন্ধন ঘুচেনা, আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তিও হয় না; ইহা তাঁহাদের কাম্যও নয়। যাঁহারা মোক্ষকামী, তাঁহাদের আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তি হয়, চিদানন্দও তাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন। তাঁহাদের সাধন আবার অনেক রকমের। যাঁহারা পরমাত্মার সঙ্গে মিলন চাহেন, তাঁহাদের সাধনকে বলে যোগমার্গ। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য (বা তাদাত্ম্য) চাহেন, তাঁহাদের সাধনের নাম জ্ঞান-মার্গ। যাঁহারা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে ভগবৎ-পার্ষদত্ব চাহেন, তাঁহাদের সাধনকে বলে ভক্তিমার্গ—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তা ভক্তি। তাঁহাদের ভাব তদীয়তাময়। আর, যাঁহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ মাধুর্য্যময় মদীয়তার ভাবে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেমসেবা চাহেন, তাঁহাদের সাধনকে বলে শুদ্ধাভক্তিমার্গ বা নির্গুণা ভক্তিমার্গ।

এই সমস্ত সাধন-পন্থার উপরেই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ব্যাপ্তি আছে। এই ব্যাপ্তি আবার দুই রকমের—আনুষঙ্গিক ভাবে সাহচর্য্যদানরূপ ব্যাপ্তি এবং স্বতন্ত্ররূপে ব্যাপ্তি।

কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানেতে সাহচর্য্যদানরূপ ব্যাপ্তি। "ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান। ২।২২।১৪॥" ভক্তির সাহচর্য্যব্যতীত কর্ম্ম, যোগ বা জ্ঞানমার্গের সাধন স্ব-স্ব-ফল দান করিতে পারেনা (২।২২।১৪ পয়ারের টীকা, ৩।৪।৬৫ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় "অভিধেয়-তত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং কর্ম্মমার্গে, যোগমার্গে ও জ্ঞানমার্গে সাধনের সহায়কারিণীরূপে ভক্তির ব্যাপ্তি আছে। আবার ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (পরবর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য) বলিয়া কর্ম্ম-যোগাদিতে নাম-সঙ্কীর্ত্তনেরও সহায়কারিরূপে ব্যাপ্তি আছে।

স্বতন্ত্ররূপে ব্যাপ্তি। কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি-মার্গে শাস্ত্রে যে সমস্ত সাধনাঙ্গের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, সে সমস্ত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান না করিয়া, স্বীয় অভীষ্টকে চিত্তে পোষণ করিয়া, যদি কেবল মাত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তনই করা হয়, তাহা হইলেও বিভিন্ন-পন্থার সাধক স্ব-স্ব অভীষ্ট ফল পাইতে পারেন; নাম-সঙ্কীর্ত্তন স্বতন্ত্র ভাবেই সে সমস্ত ফল দানে সমর্থ। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ ২।১।১১॥—ফলাকাঙ্ক্ষী সকাম-ব্যক্তিদিগের অভীষ্ঠ-প্রাপ্তি বিষয়ে, নির্ব্বেদ-ভাবাপন্ন মুমুক্ষুদিগের মোক্ষ-প্রাপ্তি-বিষয়ে, যোগীদিগের পরমাত্মার সহিত মিলন প্রাপ্তি-বিষয়ে—কর্ম্মি-যোগি-জ্ঞানীদিগের স্ব-স্ব অভীষ্ট ফল-প্রাপ্তি-বিষয়ে—শ্রীহরির নামকীর্ত্তনই হইতেছে একমাত্র বিঘ্নাদির আশঙ্কাশূন্য নিরাপদ পন্থা।" বরাহপুরাণও বলেন—"নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেবেতি যো নরঃ। সততং কীর্ত্তয়েদ্ ভূমি যাতি মল্লয়তাং স হি॥—হ, ভ, বি। ১১।২০৮ ধৃত প্রমাণ॥—ভগবান্ বলিতেছেন, হে ভূমি, যে ব্যক্তি নিরন্তর হে নারায়ণ, হে অচ্যুত, হে বাসুদেব, এই সকল নামকীর্ত্তন করেন, তিনি আমার সহিত সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।" গরুড়পুরাণও বলেন—"কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক। মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্॥ হ, ভ, বি,। ১১।২০৮ ধৃত প্রমাণ॥—হে রাজেন্দ্র, সাংখ্যযোগে বা অষ্টাঙ্গ-যোগে কি করিবে? যদি মুক্তি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে গোবিন্দ-নাম কীর্ত্তন কর।" এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—কেবল মাত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ফলে সকাম সাধক তাঁহার অভীষ্ট স্বর্গাদিলোকের সুখ ভোগ পাইতে পারেন, যোগমার্গের সাধক তাঁহার অভীষ্ট পরমাত্মার সহিত মিলন লাভ করিতে পারেন, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু তাঁহার অভীষ্ট সাযুজ্য-মুক্তিও লাভ করিতে পারেন। আবার, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ফলে যে সালোক্যাদি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া সাধক মহা বৈকুণ্ঠে বা বিষ্ণুলোকেও পার্ষদত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহাও শাস্ত্র হইতে জানা যায়। লিঙ্গপুরাণে দৃষ্ট হয়, নারদের নিকটে শ্রীশিব বলিতেছেন—"ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিমর্দ্দনম্। কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ॥ হ, ভ, বি, ১১।২১৯ ধৃত প্রমাণ॥—গমনে, উপবেশনে বা দণ্ডায়মান অবস্থায়, শয়নে, ভোজনে, শ্বাস-প্রক্ষেপ-কালে, কি বাক্য-পূরণে, কি হেলায়ও যদি কেহ কলিমর্দ্দন হরিনাম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি হরির স্বরূপতা (ব্রহ্মত্ব বা মুক্তি) লাভ করেন; আর, ভক্তিযুক্ত হইয়া যিনি নামকীর্ত্তন করেন, তিনি বৈকুণ্ঠ-লোক প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারেন।" নারদীয়পুরাণে দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মা বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণঃ শ্বপচীং ভুঞ্জন্ বিশেষেণ রজস্বলাম্। অশ্নাতি সুরয়া পক্কং মরণে হরিমুচ্চরন্। অভক্ষ্যাগম্যায়ার্জ্জাতং বিহায়াঘৌঘসঞ্চয়ন্। প্রযাতি বিষ্ণুসালোক্যং বিমুক্তো ভববন্ধনৈঃ॥ হ, ভ, বি, । ১১।২২০ ধৃত প্রমাণ॥—ব্রাহ্মণও যদি রজস্বলা শ্বপচীতেও গমন করেন, কিম্বা যদি সুরাদ্বারা পাচিত অন্নও ভোজন করেন, তথাপি যদি তিনি মৃত্যুকালে হরিনাম উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেই অগম্যা-গমন ও অভক্ষ্য-ভক্ষণ জনিত পাপ হইতে এবং সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুসালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" বৃহন্নারদীয়-পুরাণে দৃষ্ট হয়, বলিমহারাজ শুক্রাচার্য্যকে বলিতেছেন—"জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্॥ হ, ভ, বি ১১।২২১ ধৃত প্রমাণ।—যাঁহার জিহ্বাগ্রে হরি এই অক্ষর দুইটী বর্ত্তমান, তাঁহার বিষ্ণুলোকে গতি হয় এবং তাঁহাকে আর সংসারে আসিতে হয় না।"

এইরূপে দেখা গেল—সকাম সাধকের ইহকালের বা পরকালের সুখ-ভোগাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চবিধা মুক্তি পর্য্যন্ত, কেবল মাত্র নামকীর্ত্তনের ফলেই পাওয়া যাইতে পারে। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি হইল ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্র ভক্তিমার্গের ফল। কিন্তু এ সমস্তই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র ফলও নহে, মুখ্য ফলও নহে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মুখ্য ফল বা পরম ফল হইতেছে—প্রেম, ভগবদ্‌বিষয়ক প্রেম, যাহার ফলে ভগবান্ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন এবং নামকীর্ত্তন-কারীর বশীভূত হইয়া পড়েন।

পূর্ব্বোল্লিখিত স্বর্গাদি-সুখভোগ বা পঞ্চবিধা মুক্তিও ভগবান্‌ই দিয়া থাকেন; নামকীর্ত্তনের ফলে তিনি প্রীতি লাভ করেন এবং প্রীতি লাভ করিয়াই নাম-কীর্ত্তনকারীকে তাঁহার অভীষ্ট বস্তু দিয়া থাকেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"-এই গীতাবাক্যানুসারে। কিন্তু যে প্রীতির বশে তিনি এ-সমস্ত ফল দিয়া থাকেন, তাহা—নামের মুখ্য ফল যে ভগবৎ-প্রেম, সেই প্রেম হইতে ভগবানের চিত্তে উদ্বুদ্ধ প্রীতি নহে। ফলকামী বা সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তিকামী—ইঁহাদের প্রত্যেকেই নিজের জন্য কিছু চাহেন—কেহ চাহেন স্বর্গাদি-সুখ, কেহ চাহেন মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি এবং তাহার পরে সাযুজ্য বা সালোক্যাদি। এ-সকল দিলেই ভগবান্ যেন সাধকের নিকট হইতে "ছুটী"-পাইয়া যায়েন, দেনা-পাওনা যেন কতকটা শোধ-বাদ হইয়া যায়। এই ভাবে কেবল ভুক্তি-মুক্তি যাঁহারা চাহেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া থাকেন; এবং ভুক্তি-মুক্তি পাইয়াই সাধক নিজেকে পরম-কৃতার্থ মনে করেন; মনে করেন—ভগবানের নিকট যাহা চাহিয়াছি, তাহাই পাইয়াছি, আর আমার প্রার্থনার কিছু নাই। এইরূপই যাঁহাদের মনের অবস্থা, ভগবান্ তাঁহাদিগকে নামের মুখ্য ফল যে প্রেম, তাহা দেন না। "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয়, রাখেন লুকাইয়া॥ ১।৮।১৬॥ তত্রত্য টীকা দ্রষ্টব্য॥" প্রেম-শব্দের অর্থই হইল—শ্রীকৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনা। সুতরাং যাঁহারা এই প্রেম চাহেন, তাঁহারা নিজেদের জন্য কিছুই চাহেন না, এমন কি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিও তাঁহারা চাহেন না। ভগবান্ যদি তাঁহাদিগকে পঞ্চবিধা মুক্তিও দিতে চাহেন, তাহাও তাঁহারা গ্রহণ করেন না; যেহেতু, তাঁহারা চাহেন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবা, শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের সেবা; তাহার বিনিময়েও তাঁহারা নিজেদের জন্য কিছু চাহেন না। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—"সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ শ্রীভা, ৩।২৯।১৩॥" এইরূপই যাঁহাদের মনের অবস্থা,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহাদের নিজের জন্য দেওয়ার কিছুই ভগবানের পক্ষে থাকে না; সুতরাং ভগবানের পক্ষে তাঁহার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥"-বাক্যই তাঁহাদের সম্বন্ধে নিরর্থক হইয়া পড়ে। তাঁহাদের নিজেদের জন্য কিছু দেওয়া তো সম্ভবই নয়; আবার, তাঁহারা যাহা চাহেন, তাহা দিতে গেলে ভগবানের নিজেরই কিছু পাওয়া হইয়া যায়—তাঁহাদের কৃত স্বীয় সুখ-হেতুক সেবন। এইরূপ সাধকদের সাধনে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ যদি তাঁহাদের সাক্ষাতে উপনীত হইয়া বলেন—"কি চাও, বল; যাহা চাও তাহাই দিব। সালোক্যাদি মুক্তি চাহিলে তাহাও দিব", তাহা হইলে ভক্ত সাধকগণের প্রত্যেকেই বলিবেন—"প্রভু, আমি সালোক্যাদি কোনওরূপ মুক্তি চাইনা। আমি চাই তোমার চরণ; কৃপা করিয়া চরণ-সেবা দিলেই আমি কৃতার্থ হইব।" পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে সত্যবাক্, সত্যসঙ্কল্প ভগবানকে "তথাস্তু" না বলিয়া উপায় নাই; ভক্তকে স্বীয় চরণ দান করিতেই হয়। ইহাতেই তিনি নিজে আট্‌কা পড়িয়া গেলেন, সেই সাধক-ভক্তের নিকট হইতে তাঁহার আর চলিয়া যাওয়ার—ছুটী পাওয়ার—উপায় থাকে না। যাঁর চরণই আট্‌কা পড়িয়া গেল, তিনি আর চলিয়া যাইবেন কিরূপে? "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ" সেই সাধকদের প্রেমবশ্যতা অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদের হৃদয়েই পরমানন্দে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নিকটে ভগবানের বশ্যতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতে থাকে, তিনি আর তাঁহাদের নিকট হইতে "ছুটী" পাইতে পারেন না, তাঁহাদের প্রীতির বশীভূত হইয়া তাঁহাদের প্রীতিরজ্জুদ্বারা তাঁহাদের চিত্তে চিরকালের জন্যই তিনি আবদ্ধ হইয়া থাকেন এবং এইরূপে আবদ্ধ হইয়া থাকিতেই তিনিও পরম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপই প্রেমের ভগবৎ-বশীকরণী শক্তি। সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্, পরম-স্বতন্ত্র হইয়াও ভগবান্ যে প্রেমের নিকটে এই ভাবে বশ্যতা স্বীকার করেন, সেই প্রেম যে সাধন-ভজনের সর্ব্ববিধ ফলের মধ্যে মুখ্যতম ফল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। যাঁহারা ভুক্তি-মুক্তি না চাহিয়া কেবল মাত্র এই জাতীয় প্রেম লাভের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তন করেন, সঙ্কীর্ত্তনের ফলে তাঁহারা এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণী শক্তি সম্পন্ন প্রেমই লাভ করিতে পারেন। ইহাই নামের মুখ্য ফল।

আদিপুরাণে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিতেছেন, "গীত্বা চ মম নামানি নর্ত্তয়েন্মমসন্নিধৌ। ইদং ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তেন চার্জ্জুন॥ গীত্বা চ মম নামানি রুদন্তি মম সন্নিধৌ। তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো জনার্দ্দনঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।২৩১ ধৃত প্রমাণ।—হে অর্জ্জুন, যাঁহারা আমার নাম গান করিয়া আমার সাক্ষাতে নৃত্য করিয়া থাকেন, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি তাঁহাদের দ্বারা ক্রীত হইয়া থাকি। যাঁহারা আমার নাম গান করিয়া আমার সমক্ষে রোদন করিয়া থাকেন, জনার্দ্দন আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদেরই ক্রীত—বশীভূত হইয়া থাকি। অপর কাহারও ক্রীত হই না।" আবার মহাভারত হইতে জানা যায়—বিষম বিপদে পতিত হইয়া কৃষ্ণা—দ্রৌপদী—"গোবিন্দ, গোবিন্দ" বলিয়া উচ্চস্বরে আর্ত্তকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্রৌপদী হইতে বহুদূরে—দ্বারকায় অবস্থিত; তথাপি কৃষ্ণার আকুল প্রাণের কাতর আহ্বান তাঁহার হৃদয়ে এক তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। এই বিহ্বলতার ফলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি। যদ্ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥ হ, ভ, বি, ১১।২৩১ ধৃত মহাভারত-বচন॥—কৃষ্ণা যে দূরবাসী আমাকে আর্ত্তকণ্ঠে "গোবিন্দ-গোবিন্দ" বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতেছেন, তাঁহার এই গোবিন্দ-ডাকই আমার প্রবৃদ্ধ—ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল—ঋণ হইয়া পড়িয়াছে, ইহা আমার হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে না।" তাৎপর্য্য এই যে—আর্ত্তকণ্ঠে আমার 'গোবিন্দ' নাম উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণা আমাকে চিরকালের জন্য অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহার নিকটে আমার প্রেম-বশ্যতা ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইয়া চলিতেছে।"

উক্ত আলোচনায় পুরাণেতিহাসের যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা শ্রুতি-বাক্যেরই প্রতিধ্বনি। ভগবন্নামের ঐরূপ মাহাত্ম্যের কথা শ্রুতিও বলেন। তাহাই দেখান হইতেছে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রুতি বলেন, প্রণবই ব্রহ্ম। "ওম্ ইতি ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয়। ১.৮॥" সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা বলেন—শ্রীকৃষ্ণই প্রণব, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেবচ॥ ৯।১৭॥ পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১০।১২॥" এই প্রণব-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে অনন্ত-স্বরূপ-রূপে আত্মপ্রকটিত অবস্থায় আছেন। "একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি। গোপাল-তাপনীশ্রুতি॥" গুণ-কর্ম্মানুসারে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরও বহু নাম আছে এবং তাঁহার অনন্ত-স্বরূপ-সমূহেরও বহু নাম আছে। তাই গর্গাচার্য্য নন্দমহারাজের নিকটে বলিয়াছেন—"বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ শ্রীভা, ১০।৮।১৫॥" প্রণব যেমন তাঁহার স্বরূপ, প্রণব আবার তাঁহার বাচকও—নামও। পাতঞ্জলই একথা বলিয়াছেন—"ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥ সমাধিপাদ। ২৭॥" প্রণব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ যেমন বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ, তদ্রূপ তাঁহার বাচক-প্রণবের বিভিন্ন প্রকাশও হইতেছে তাঁহার বিভিন্ন নাম। অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ যেমন এক শ্রীকৃষ্ণেতেই অবস্থিত (একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ; বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্), তদ্রূপ তাঁহার এবং তাঁহার অনন্ত স্বরূপের নামও তাঁহার বাচক প্রণবের মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং তাঁহার বাচক-প্রণবের উল্লেখে তাঁহার অনন্ত নামই উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই কথাগুলি স্মরণে রাখিয়াই নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রুতি-বাক্যগুলি বিবেচিত হইতেছে।

কঠোপনিষৎ বলেন—"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ ১.২।১৬॥—এই প্রণবের (নামের) অক্ষরকে জানিলেই যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা পাইতে পারেন।" তাৎপর্য্য হইল এই—কি ইহকালের সুখ, কি পরকালের স্বর্গাদিসুখ, কি সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তি, কি প্রেম, এসমস্তের মধ্যে যিনি যাহা পাইতে ইচ্ছা করেন, নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি তাহাই পাইতে পারেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যে কঠোপনিষৎ নামাশ্রয়ে প্রেম-প্রাপ্তির কথা এবং তদ্দ্বারা জীবের পরম-পুরুষার্থলাভের কথাও বলিয়া গিয়াছেন। "এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১।২।১৭॥—এই প্রণব বা নামই হইতেছে শ্রেষ্ঠ এবং পরম অবলম্বনীয় বস্তু। এই নামরূপ পরম অবলম্বনীয় বস্তুকে জানিলে জীব ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হইতে পারে।" কিন্তু উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে উল্লিখিত ব্রহ্মলোকই বা কি এবং ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হওয়ায় তাৎপর্য্যই বা কি?

কঠোপনিষৎ পরব্রহ্মের কথাই বলিয়াছেন। "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ কঠ ১.২।১৬॥" সুতরাং ব্রহ্মলোক বলিতেও এস্থলে সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লোক বা ধামের—ব্রজধামের—কথাই বলা হইয়াছে—ঋগ্বেদের "যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গাঃ"—বাক্যেও যে ব্রজধামের কথাই বলা হইয়াছে।

নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান ব্রজধামে মহীয়ান্ হইতে পারে। কিরূপে?

কোনও বস্তুর স্বরূপগত-ধর্ম্মের সম্যক্ বিকাশেই সেই বস্তু সম্যক্‌রূপে মহীয়ান্ হইতে পারে। একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি হইতে যে অগ্নি-শিখা পাওয়া যায়, তাহার দাহিকা-শক্তি হইল তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। ঐ শিখাটি দ্বারা একখণ্ড ক্ষুদ্র কাগজও পোড়ান যায়, আবার গ্রামকে গ্রামও ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া যায়। ক্ষুদ্র কাগজ-খণ্ডকে দগ্ধ করা অপেক্ষা গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়াতেই দিয়াশলাইয়ের কাঠি হইতে জাত অগ্নিশিখার স্বরূপগত ধর্ম্মের বিকাশ বেশী এবং তাহাতেই অগ্নিশিখা বেশী মহীয়ান্ হইয়া থাকে। জীব স্বরূপে নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনাই হইল তাহার স্বরূপগত-বাসনা। তাহার এই স্বরূপগত-বাসনা যখন অপ্রতিহত ভাবে সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ লাভ করে এবং সেই সর্ব্বাতিশায়িরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যখন সেবারূপ কার্য্যে সম্যক্‌রূপে রূপায়িত হয়, তখনই বলা যায়—সেই জীব মহীয়ান্ হইয়াছে। সাযুজ্যমুক্তিতে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান থাকে বলিয়া সেব্য-সেবকত্বের ভাবই স্ফুরিত হয় না, সেবা-বাসনা-স্ফুরণতো দূরে। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে সেব্য-সেবক-ভাব স্ফুরিত হয় বটে; কিন্তু ভক্তের চিত্তে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া সেবা-বাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সম্যক্ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। ব্রজধামে মমত্ববুদ্ধির আধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, পরিকর ভক্তগণ ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের আপনজন বলিয়া মনে করেন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তাঁহাদের সেবাবাসনাকে বিকাশের পথে বাধা দিতে পারে না। নামের কৃপায় সাধক এই ধামে পরিকরত্ব লাভ করিতে পারেন এবং তখন তাঁহার সেবা-বাসনাও সম্যক্‌রূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে এবং সেই বাসনাও সেবায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। তখনই সেই জীব সম্যক্‌রূপে মহীয়ান্ হইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনার নামই প্রেম। সুতরাং নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমলাভ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন, কঠোপনিষদের "এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে"—বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে।

নামের মাহাত্ম্যের কথা ঋগবেদও বলিয়া গিয়াছেন। "ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সদিত্যাদি। ১।১৫৬।৩॥—হে বিষ্ণো, তে (তব) নাম চিৎ (চিৎস্বরূপম্) অতএব মহঃ (স্বপ্রকাশরূপম্) তস্মাৎ অস্য (নাম্নঃ) আ (ঈষদপি) জানন্তঃ (ন তু সম্যক্ উচ্চারণ-মাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ, তথাপি) বিবক্তন্ (ব্রুবাণাঃ, কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ) সুমতিং (তদ্বিষয়াং বিদ্যাম্) ভজামহে (প্রাপ্নুমঃ)। যতঃ ওঁ তৎ (প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু) সৎ (স্বতঃসিদ্ধম্) ইতি। শ্রীজীব।" তাৎপর্য্য এই:—হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎ-স্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ। সুতরাং এই নামের উচ্চারণ-মাহাত্ম্যাদি সম্যক্‌রূপে না জানিয়াও, সামান্য কিছুমাত্র জানিয়াও যদি আমরা কেবল সেই অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করিয়া যাই, তাহারই ফলে আমরা তোমাবিষয়িণী বিদ্যা (ভক্তি) লাভ করিতে পারিব। যেহেতু, ইহা প্রণবব্যঞ্জিত বস্তু, সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ। ১।১৭।২০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

উক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল, সকল রকমের সাধন-পন্থার উপরেই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ব্যাপ্তি আছে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে পরম-উপায় বলার ইহা একটী হেতু।

(খ) উল্লিখিত (ক)-আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল—বিভিন্ন সাধন-পন্থায় যে বিভিন্ন ফল পাওয়া যায়, নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সাধকের অভীষ্টানুযায়ী সে সমস্ত বিভিন্ন ফলও পাওয়া যায়। সুতরাং, সমস্ত সাধন-পন্থার ফলের উপরেও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের **ব্যাপ্তি** আছে। ইহাও নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে পরম উপায় বলার একটা হেতু।

(গ) উল্লিখিত (ক)-আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল যে—বিভিন্ন প্রকারের সাধনে যে সমস্ত বিভিন্ন ফল পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ভগবদ্‌বিষয়ক প্রেম হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল; সুতরাং ইহা হইল নামসঙ্কীর্ত্তনের পরমতম ফল। নাম-সঙ্কীর্ত্তনে এই পরমতম ফল প্রেম পাওয়া যায় বলিয়াও ইহাকে "পরম উপায়" বলা হইয়াছে।

(ঘ) নাম-সঙ্কীর্ত্তনের **শক্তির বৈশিষ্ট্যও** ইহাকে পরম-উপায় বলার আর একটী হেতু। এই শক্তির বৈশিষ্ট্য কি, দেখা যাউক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি যত রকমের সাধন-পন্থা আছে, ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত তাহাদের কোনও পন্থাই স্বীয় ফল দান করিতে পারেনা। ইহাতেই কর্ম্ম-যোগাদি অপেক্ষা ভক্তির শক্তি-বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে।

ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি-মার্গের জন্য বিহিত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান না করিয়া সাধকগণ যদি সেই সেই মার্গের লভ্য ফল-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া কেবল ভক্তি-অঙ্গেরই অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা স্ব-স্ব অভীষ্ট কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির ফল পাইতে পারেন। ইহাও কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি অপেক্ষা ভক্তি-সাধনের শক্তির এক বৈশিষ্ট্য।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আবার "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ শ্রীভা, ১১।১৪।২০॥"—এই প্রমাণ হইতেও জ্ঞান-যোগাদি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণ-সামর্থ্যে ভক্তির উৎকর্ষের কথা জানা যায়।

এ সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে—"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেম দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন। ৩।৪।৬৪-৭১॥" যত রকম সাধন-পন্থা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ভক্তি-পন্থাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সাধন-ভক্তির মধ্যে আবার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ; যেহেতু, এই নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানে সাধকের অভিপ্রায়-অনুরূপ বিভিন্ন সাধন-পন্থার ফল তো পাওয়া যায়ই, সাধকের ইচ্ছানুরূপভাবে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি এবং কৃষ্ণ-প্রেম-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। এই নববিধা ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে আবার নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইল শ্রেষ্ঠ; যেহেতু, কেবলমাত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতেই সকল রকমের সাধন-পন্থার ফল পাওয়া যাইতে পারে (পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য) এবং "নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥ ৩।৪।৬৫॥" আবার "নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥ ২।১৫।১০৮॥"

শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত-গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ে ১২৪-৪৩ শ্লোকে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ১৪৫-৭৩ শ্লোকে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্বের হেতুরূপে উক্তগ্রন্থ বলেনঃ—(১) নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে শীঘ্রই প্রেম-সম্পত্তির উদয় হয়, যাহার ফলে সুখে বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণদর্শন লাভ হইতে পারে। "তয়াশু তাদৃশী প্রেমসম্পদুৎপাদয়িষ্যতে। যয়া সুখং তে ভবিতা বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণদর্শনম্। বৃ, ভাঃ ২।৩।১৪৫॥" (২) স্মরণ-মননই প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু জীবের চঞ্চল চিত্তে স্মরণ-মনন সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয় না। স্মরণ-মনন সিদ্ধির নিমিত্ত চিত্তকে সংযত করা দরকার। কিন্তু চিত্তকে সংযত করিতে হইলে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রয়োজন। কারণ, বাগিন্দ্রিয়ই (জিহ্বাই) হইল সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়ের ও চিত্তাদি অন্তরিন্দ্রিয়ের চালক (এই পয়ারের "নাম-সঙ্কীর্ত্তন"-শব্দের ব্যাখ্যার পরের আলোচনা দ্রষ্টব্য); বাগিন্দ্রিয় সংযত হইলেই সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় ও চিত্তাদি অন্তরিন্দ্রিয় সংযত হইতে পারে। "বাহ্যান্তরাশেষ-হৃষীকচালকং বাগিন্দ্রিয়ং স্যাদ্ যদি সংযতং সদা। চিত্তং স্থিরং সদ্ ভগবৎ-স্মৃতৌ তদা সম্যক্ প্রবর্ত্তেত ততঃ স্মৃতিঃ ফলম্॥ বৃ, ভা, ২।৩।১৪৯॥" কিন্তু বাগিন্দ্রিয়কে সংযত করিতে হইলে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রয়োজন; যেহেতু, নাম-সংকীর্ত্তন বাগিন্দ্রিয়ে নৃত্য করিয়া তাহাকে সংযত করে, সঙ্গে সঙ্গে চিত্তমধ্যে বিহার করিয়াও চিত্তকে সংযত করে; আবার কীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়কেও কৃতার্থ করিয়া থাকে। এইরূপে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই হইল অন্তরঙ্গ-সাধন-ভক্তি-শ্রেষ্ঠ-স্মরণমননের আনুকূল্য-বিধায়ক। "প্রেম্ণোঽন্তরঙ্গং কিল সাধনোত্তমং মন্যেত কৈশ্চিৎ স্মরণং ন কীর্ত্তনম্। একেন্দ্রিয়ে বাচি বিচেতনে সুখং ভক্তিঃ স্ফুরত্যাশু হি কীর্ত্তনাত্মিকা॥ ভক্তিঃ প্রকৃষ্টা স্মরণাত্মিকাস্মিন্ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামধিপে বিলোলে। ঘোরে বলিষ্ঠে মনসি প্রয়াসৈর্নীতে বশং ভাতি বিশোধিতে যা॥ মন্যামহে কীর্ত্তনমেব সত্তমং লীলাত্মকৈকস্বহৃদি স্ফুরৎস্মৃতেঃ। বাচি স্বযুক্তে মনসি শ্রুতৌ তথা দীব্যৎ পরানপ্যুপকুর্ব্বদাত্মবৎ॥ বৃ, ভা, ২।৩।১৪৬-৪৮॥" (৩) নাম-সঙ্কীর্ত্তন নির্জ্জনত্বের বা একাকিত্বের অপেক্ষা রাখেনা। "একাকিত্বেন তু ধ্যানং বিবিক্তে খলু সিদ্ধ্যতি। সঙ্কীর্ত্তনে বিবিক্তেঽপি বহূনাং সঙ্গতোঽপি চ॥ বৃ, ভা, ২।৩।১৫৭॥" এবং (৪) নামামৃত একটী ইন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় মধুর-রসে সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই সম্যক্‌রূপে প্লাবিত করিয়া থাকে। "একস্মিন্নিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ। আপ্লাবয়তি সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈ র্নিজৈঃ॥ বৃ, ভা, ২।৩।১৬২॥" ইত্যাদি।

উল্লিখিত প্রমাণ-সমূহদ্বারা নাম-সঙ্কীর্ত্তনের শক্তির পরম-বৈশিষ্ট্যের কথা জানা গেল।

(৬) নাম-সঙ্কীর্ত্তনের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা **দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাদির অপেক্ষা রাখেনা।** "এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়। নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥ দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডালে সভারে উদ্ধারে॥ আনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়। চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ-প্রেমোদয়॥ ২।১৫।১০৮-১০॥”

(চ) নাম যে কেবল দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাদিরই অপেক্ষা রাখেনা, তাহা নয়, **দেশ-কাল-পাত্র-দশাদির অপেক্ষাও রাখেনা।** যে কোনও লোক, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে, যে কোনও অবস্থায় নাম-কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। যাহারা অনন্যগতি, নিয়ত বিষয়ভোগী, পরপীড়ক, জ্ঞানবৈরাগ্য বর্জ্জিত, ব্রহ্মচর্য্য-শূন্য এবং সর্ব্বধর্ম্মত্যাগী, তাহারাও যদি শ্রীবিষ্ণুর নামমাত্র জপ করিতে থাকে, তাহা হইলে অনায়াসে ধর্ম্মিষ্ঠদিগেরও দুর্ল্লভ গতি লাভ করিতে পারে। “অনন্যগতয়োমর্ত্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদি-বর্জ্জিতাঃ॥ সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণো র্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ। সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ॥ হ,ভ,বি, ১১।২০১ ধৃত পদ্মবচন॥”

স্ত্রীলোক, শূদ্র, চণ্ডাল, এমন কি অন্য কোনও পাপ-যোনি জাত লোকও যদি ভক্তিভরে হরিনাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহারাও বন্দনীয়। “স্ত্রী শূদ্রঃ পুকশো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ। কীর্ত্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।২০১ ধৃত শ্রীনারায়ণব্যূহস্তব-বচন॥”

নাম-সঙ্কীর্ত্তন-বিষয়ে স্থানের পবিত্রতা বা অপবিত্রতার বিচার করারও প্রয়োজন নাই, সময় সম্বন্ধেও কোনও বিচারের প্রয়োজন নাই, উচ্ছিষ্টমুখে নাম-গ্রহণেও নিসেধ নাই। “ন দেশনিয়ম স্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিসেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥ হ, ভ, বি, ১১।২০২ ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মবচন॥”

অশৌচ-অবস্থায়ও নাম-কীর্ত্তনের বাধা নাই। ভগবানের নাম পরম-পাবন, সমস্ত অশুচিকে শুচি করে, অপবিত্রকে পবিত্র করে। সকল সময়ে এবং সকল স্থানেই নাম কীর্ত্তনীয়। “চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ। নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।২০৩ ধৃত স্কান্দ-পাদ্ম-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-প্রমাণ॥” আবার “ন দেশকালনিয়মো ন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ। পরং সঙ্কীর্ত্তনাদেব রামরামেতি মুচ্যতে॥ হ, ভ, বি, ১১।২০১ ধৃত বৈশ্বানরসংহিতা-বচন॥”

নাম স্বতন্ত্র বলিয়াই কোনওরূপ বিধি-নিসেধের অধীন নহেন। “নো দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে। কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্॥ হ, ভ, বি, ১১।২০৪-ধৃত স্কান্দবচন॥”

চলা-ফেরা করার সময়ে, দাঁড়াইয়া থাকা বা বসিয়া থাকার সময়ে, বিছানায় শুইয়া শুইয়া, খাইতে খাইতে, শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলার সময়ে, বাক্য-প্রপূরণে, কি হেলায়-শ্রদ্ধায় নাম উচ্চারণ বা কীর্ত্তন করিয়াও কৃতার্থতা লাভ করা যায়। “ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্য-প্রপূরণে। নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিমর্দ্দনম্। কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ॥ হ, ভ, বি, ১১।২১৯-ধৃত লিঙ্গপুরাণবচন॥” শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—“খাইতে শুইতে যথাতথা নাম লয়। দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ ৩।২০।১৪॥”

অন্য কোনও সাধনাঙ্গের এইরূপ স্বাতন্ত্র্য নাই; এজন্যও নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে পরম উপায় বলা যায়।

(ছ) নামের **অসাধারণ কৃপা**—নাম-শব্দের মুখ্যার্থ বিবেচনা করিলে নামের কৃপার কথা জানা যায়। নম্-ধাতু হইতে নাম-শব্দ নিষ্পন্ন। নম্-ধাতুর অর্থ নামানো—নামাইয়া আনা। নময়তি ইতি নাম। যাহা নামাইয়া আনে, তাহা নাম। ভগবানের নাম নামাইয়া আনেন। কাহাকে কোথা হইতে নামান? দুই জনকে নামান—নাম-কীর্ত্তনকারীকে এবং নামী ভগবান্‌কে। দেহেতে আবেশ, দেহেতে আত্মবুদ্ধি আছে বলিয়া জীবমাত্রেরই কোনও না কোনও একটী বিষয়ে অভিমান আছে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত দেহাবেশ-জনিত অভিমান হৃদয়ে থাকে, সে-পর্য্যন্ত ভগবানের কোনওরূপ উপলব্ধি সম্ভব নয়। “অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন॥ শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়॥” নাম স্বীয় প্রভাবে নামকীর্ত্তনকারীকে অভিমানরূপ উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শিখর হইতে নামাইয়া আনেন,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহার অভিমান দূর করিয়া তাহার চিত্তকে বিশুদ্ধ করেন। আর নাম এমনই শক্তি-সম্পন্ন যে, ভগবানকেও নাম-গ্রহণকারীর নিকটে নামাইয়া নিয়া আসেন, নাম-গ্রহণকারীকে ভগবানের দর্শন দেওয়ান, ভগবানের চিত্তে কৃপা উদ্বুদ্ধ করিয়া নাম-গ্রহণকারীর অভীষ্ট পূর্ণ করেন। ধ্রুব পদ্ম-পলাশ-লোচনকে কাতর প্রাণে ডাকিয়াছিলেন; এই ডাকার ফলে পদ্ম-পলাশ-লোচন শ্রীহরি ধ্রুবকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

অন্য এক ব্যাপারেও নামের অসাধারণ কৃপার প্রকাশ দৃষ্ট হয়। নাম অপ্রাকৃত বলিয়া জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে গ্রহণীয় নহেন; কিন্তু যে লোক নাম-কীর্ত্তনদাদির ইচ্ছা করেন, নাম কৃপা করিয়া তাঁহার জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ ভ, র, সি, ১।২।১০৯॥" (২।১৭।৬-শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য)। কিন্তু নামী শ্রীভগবান্‌কে কেহ দর্শন করিতে চাহিলেই ভগবান্ তাহাকে দর্শন দেন না। ইহাই নামী হইতে নামের কৃপার এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য।

নাম স্বপ্রকাশ বলিয়া যে কোনও লোকের জিহ্বাদিতেই আত্ম-প্রকাশ করিতে পারেন—সেই লোক কীর্ত্তনাদির ইচ্ছা করিলেও পারেন, না করিলেও পারেন। কোনও কোনও ভাগ্যবানের নিদ্রিত অবস্থাতেও তাঁহার জিহ্বায় নাম উচ্চারিত হইতে শুনা যায়। এত কৃপা নামের। এইরূপ কৃপা অন্য কোনও সাধনাঙ্গের দেখা যায় না।

নামের কৃপার আর একটী অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে—জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবান্‌ও অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার নামও অবতীর্ণ হয়েন। কিন্তু যথাসময়ে ভগবান্ অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন; নাম কিন্তু অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন না; জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, ভগবানের অন্তর্দ্ধানের পরেও সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য নাম জগতে থাকিয়া যায়েন।

নামের কৃপার আর একটী দৃষ্টান্ত হইতেছে—**অপরাধ-খণ্ডনত্বে**। নামাপরাধ থাকিলে নামকীর্ত্তনকারী প্রেমও লাভ করিতে পারে না, মুক্তিও পাইতে পারে না (২।২২।৬৩-পয়ারের টীকায় নামাপরাধের বিবরণ দ্রষ্টব্য)। ঐকান্তিক ভাবে নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে নাম কৃপা করিয়া নামাপরাধ খণ্ডন করিয়া দেন। "জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন। সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥ নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্ত-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥ হ, ভ, বি, ১১।২৮৭-৮॥"

শাস্ত্রবিহিত আচরণের অকরণে, কিম্বা শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণের করণে যে অশেষবিধ পাপ হইয়া থাকে, যে কোনও ভাবে নাম উচ্চারণ করিলেই তৎ সমস্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। "বিহিতাকরণ-নিষিদ্ধাচরণজাতাখিলপাপোন্মূলন-রূপ-মাহাত্ম্যং লিখিতং তচ্চ পাপং কথঞ্চিদ্‌ভগবদাশ্রয়ণাদপি বিনশ্যত্যেব। হ, ভ, বি, ১১।১৭৯-টীকায় শ্রীপাদসনাতন।" কিন্তু ভগবানে বা ভগবন্নামে যে অপরাধ, তাহার খণ্ডন যে কোনওরূপ নামোচ্চারণেই সহজে হয় না। তজ্জন্য শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত নামকীর্ত্তন করিতে হয়। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুযামল বলেন—শ্রীভগবানই বলিয়াছেন—"মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ। তস্যাপরাধকোটিস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৭৯॥"

(জ) নাম ও নামী অভিন্ন। শ্রুতিই একথা বলেন। "ওম্ ইতি ব্রহ্ম।—প্রণব হইল ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয়। ১।৮॥" পূর্ব্বে (ক-আলোচনায়) বলা হইয়াছে—প্রণব ব্রহ্মের বাচক, নাম। তাহা হইলে তৈত্তিরীয় শ্রুতি হইতে জানা গেল, ব্রহ্মের বাচক নামই ব্রহ্ম। কঠোপনিষদও বলেন—"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।—এই নামের অক্ষরই (বা নামই) ব্রহ্ম। ১।২।১৬॥"

শ্রুতির এই বাক্যকে পুরাণ আরও বিষদ্ ভাবে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস-বিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥ ভ, র, সি, ১।২।১০৮-ধৃত পদ্মপুরাণ-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন॥ (২।১৭।৫-শ্লোকের টীকাদিতে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবিভূর্তম্।—একই সচ্চিদানন্দরসাদি তত্ত্ব—নাম ও নামী এই দুইরূপে আবির্ভূত।"

উল্লিখিত শ্লোক হইতে জানা গেল—নাম ও নামী-ভগবান্ অভিন্ন বলিয়া নাম ও নামী উভয়েই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, উভয়েই সর্ব্বাভীষ্ট-দায়ক অপূর্ব্ব চিন্তামণিতুল্য, উভয়েই কৃষ্ণ—সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, উভয়েই চিদানন্দ-রস-বিগ্রহ, উভয়েই পূর্ণ (স্বরূপে, শক্তিতে এবং মাধুর্য্যাদিতে নিত্য পূর্ণ), উভয়েই শুদ্ধ—মায়ার স্পর্শশূন্য এবং উভয়েই নিত্যমুক্ত—নিত্য স্বতন্ত্র, বিধি-নিষেধের নিত্য অতীত, প্রকৃতিরও নিত্য অতীত, প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়াও প্রকৃতিদ্বারা নিত্য অস্পৃষ্ট (এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোহপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ শ্রীভা, ১।১১।৩৯॥)।

নাম ও নামীর অভিন্নতাবশতঃ নামী ভগবানের যেমন অসাধারণ মাহাত্ম্য, তাঁহার নামেরও তদ্রূপ মাহাত্ম্য। অপর কোনও সাধনাঙ্গের সহিত নামীর এরূপ অভিন্নতা নাই ; সুতরাং নামের ন্যায় প্রভাব অপর কোনও সাধনাঙ্গেরই নাই। এজন্যই নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে পরম উপায় বলা হইয়াছে।

স্মরণ রাখা দরকার যে, ভগবান্ (ব্রহ্ম) এবং তাঁহার নাম—এতদুভয়ই অভিন্ন। কোনও প্রাকৃত বস্তু এবং তাহার নাম কিন্তু অভিন্ন নহে। প্রাকৃত বস্তুর নাম হইল সেই বস্তুর একটী চিহ্নমাত্র—যদ্দ্বারা তাহাকে চেনা যায়। মিশ্রী হইল এক জাতীয় মিষ্ট বস্তুর নাম ; মিশ্রী বস্তুটী মিষ্ট ; কিন্তু তাহার নাম মিষ্ট নহে, "মিশ্রী মিশ্রী" বলিলে জিহ্বায় মিষ্টত্বের অনুভব হয় না। কিন্তু ভগবানের নাম তাঁহার স্বরূপের ন্যায়ই পরম-মধুর (৩।২০।৩-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

(ঋ) নামাক্ষর অপ্রাকৃত চিন্ময়। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নাম হইলেন অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু ; নামীরই ন্যায় পূর্ণ এবং নিত্যশুদ্ধ বলিয়া নাম—অপূর্ণ এবং অশুদ্ধ জড় বা প্রাকৃত বস্তু নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ। ২।১৭।১৩০॥" এইরূপে নাম চিন্ময় বস্তু বলিয়া নামের অক্ষর-সমূহও অপ্রাকৃত, চিন্ময়।

প্রাকৃত অক্ষরে ভগবানের নাম লিখিত হইলে আমরা মনে করিতে পারি—ঐ অক্ষরগুলিও প্রাকৃত ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রাকৃত ভক্ষ্য-পেয়-আদি ভগবানে অর্পিত হইলে যেমন চিন্ময় হইয়া যায় (৩।১৬।১০২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), প্রাকৃত দারুপাষাণাদিদ্বারা নির্ম্মিত ভগবদ্-বিগ্রহে ভগবান্ অধিষ্ঠিত হইলে যেমন সেই বিগ্রহ চিন্ময়ত্ব লাভ করে, তদ্রূপ প্রাকৃত অক্ষরদ্বারা লিখিত ভগবন্নামও অপ্রাকৃত চিন্ময় হইয়া যায় ; যেহেতু, সেই অক্ষরে সচ্চিদানন্দ-রসস্বরূপ নামের আবির্ভাব হয়।

নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব না জানিয়া তাঁহাকে যেমন বহির্ম্মুখ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রাকৃত মানুষ বলিয়াই মনে করে (অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ গীতা। ৯।১১॥), তদ্রূপ নামের তত্ত্ব না জানিয়া আমরাও নামের অক্ষরকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ নরাকৃতি পরব্রহ্ম যেমন সচ্চিদানন্দ, তাঁহার নাম এবং নামের অক্ষরও তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ। তাই শ্রুতিও নামাক্ষরকে ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দ বলিয়াছেন। "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম।"

(ঞ) প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত নামও চিন্ময়। প্রাকৃত জিহ্বায় যে নাম উচ্চারিত হয়, তাহাও অপ্রাকৃত, চিন্ময় ; প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত হয় বলিয়াই তাহা প্রাকৃত শব্দ হইয়া যায় না। নামীরই ন্যায় নাম পূর্ণ, শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত বলিয়া জিহ্বার প্রাকৃতত্ব তাহাকে আবৃত করিতেও পারে না, তাহার চিন্ময় স্বরূপেরও ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না। বস্তুতঃ জিহ্বার নিজের শক্তিতে, কিম্বা যাহার জিহ্বা, তাহার শক্তিতে, ভগবানের নাম উচ্চারিত হইতে পারে না। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গোচর॥" নাম অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু বলিয়া—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥—জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনামাদি গ্রহণীয় হইতে পারে না ; যে ব্যক্তি নামকীর্ত্তনাদির জন্য ইচ্ছুক হয়, নামাদি কৃপা করিয়া

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বয়ংই তাহার জিহ্বায় স্ফুরিত হয়েন।” নাম স্বতন্ত্র এবং স্বপ্রকাশ বলিয়া নিজেই তাহার জিহ্বাদিতে আত্ম-প্রকাশ করেন, আবির্ভূত হয়েন। জিহ্বার কর্তৃত্ব কিছু নাই; কর্তৃত্ব স্বপ্রকাশ-নামের, নামের কৃপার। অপবিত্র আস্তাকুড়ে যদি আগুন লাগাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই আগুন অপবিত্র হয় না; বরং তাহা আস্তাকুড়কেই পবিত্র করে; কারণ, পাবকত্ব আগুনের স্বরূপগত ধর্ম্ম। তদ্রূপ চিন্ময়ত্ব হইল নামের স্বরূপগত ধর্ম্ম; প্রাকৃত জিহ্বার স্পর্শে তাহা নষ্ট হইতে পারে না। নাম জিহ্বায় নৃত্য করিতে করিতে বরং ক্রমশঃ জিহ্বার প্রাকৃতত্বই ঘুচাইয়া দেন। ভস্মস্তূপে মহামণি পতিত হইলে তাহা ভস্মে পরিণত হয় না, তাহার মূল্যও কমিয়া যায় না। মৃত্যুকালে অজামিল “নারায়ণ নারায়ণ” বলিয়া তাঁহার পুত্রকেই ডাকিয়াছিলেন—তাঁহার প্রাকৃত জিহ্বাদ্বারা। তথাপি সেই “নারায়ণ”-নামই তাঁহার বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির হেতু হইয়াছিল। প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত (প্রকৃত-প্রস্তাবে -প্রাকৃত জিহ্বায় আবির্ভূত) নাম যদি প্রাকৃত শব্দই হইয়া যাইত, তাহা হইলে অজামিলের অশেষ পাপরাশিও ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না, তাঁহার পক্ষে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তিও সম্ভব হইত না। সূর্য্যের আলোক অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিলেও তাহা আলোকই থাকে, অন্ধকারে পরিণত হয় না।

এইরূপে, প্রাকৃত কর্ণে যে নাম শুনা যায়, প্রাকৃত মনে যে নামের স্মরণ করা যায়, প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা যে নামাক্ষর দর্শন করা যায়, প্রাকৃত ত্বকে যে নাম লিখিত হয়, সেই নামও অপ্রাকৃত চিন্ময়।

(ট) নামাভাস। নাম সর্ব্বাবস্থায় এবং সকল সময়েই অপ্রাকৃত চিন্ময় বলিয়া, নামীর সহিত অভিন্ন বলিয়া, নামাভাসেও সর্ব্ববিধ পাপ দূরীভূত হইতে পারে, মুক্তি লাভ হইতে পারে। অজামিলই তাহার সাক্ষী। বস্তুতঃ নাম ও নামাভাস স্বরূপতঃ একই অভিন্ন বস্তু; তাহা যখন নামীকে প্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলা হয় নাম; আর যখন নামী ব্যতীত অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলা হয় নামাভাস। অন্য বস্তুকে প্রকাশ করিলেও নামের শক্তি বিনষ্ট হয় না। “যদ্যপি অন্যসঙ্কেতে অন্য হয় নামাভাস। তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥ ৩।৩।৫৪॥” একটা দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। সূর্য্য ও সূর্য্যের কিরণে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই; ঘনীভূত কিরণই সূর্য্য। প্রত্যূষে সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হওয়ার পূর্ব্বেই তাহার কিরণ দৃষ্টিগোচর হয়। রাত্রির অন্ধকারে বৃক্ষাদি দৃষ্টিগোচর হইত না; প্রত্যূষে বৃক্ষাদি যখন দৃষ্টিগোচর হয়, তখনই আমরা বুঝিতে পারি—সূর্য্যের কিরণই বৃক্ষাদিকে দৃষ্টির গোচরীভূত করিয়াছে; কিরণ এস্থলে বৃক্ষাদিকে প্রকাশিত করিয়াছে, সূর্য্যকে প্রকাশিত করে নাই; এজন্যই “তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে”-ইত্যাদি (৩।৩।৪-শ্লোক দ্রষ্টব্য) শ্লোকে ঐ কিরণকে সূর্য্যের আভাস বলা হইয়াছে। অজামিলের উচ্চারিত (প্রকৃত প্রস্তাবে – অজামিলের জিহ্বায় আবিভূত) “নারায়ণ”-শব্দটী “নারায়ণ”কে প্রকাশ করে নাই, নারায়ণ-নামক ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি অজামিলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে নাই, প্রকাশ করিয়াছে তাহার পুত্রকে, পুত্রের প্রতিই তাহার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছে। তাই ইহা “নাম” না হইয়া “নামাভাস” হইয়াছে। কিন্তু নামাভাস হইলেও তদ্দ্বারা নামের শক্তিই প্রকাশিত হইয়াছে; যেহেতু, এই নামাভাসেই অজামিল পাপমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ-পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছেন।

ইহাও নামের এক অসাধারণ মহিমা।

(ঠ) নাম পূর্ণতা-বিধায়ক। নামীরই ন্যায় নাম পূর্ণ বলিয়া তাহার আর পূর্ণতা সাধনের প্রয়োজন নাই; সুতরাং নামের পূর্ণতা-সাধনের জন্যও অন্য কিছুর সাহচর্য্যের প্রশ্নও উঠিতে পারেনা। কিন্তু নাম অন্য অনুষ্ঠানের পূর্ণতা বিধান করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন মন্ত্রে স্বর-ভ্রংশাদিদ্বারা, তন্ত্রে ক্রম-বিপর্য্যয়াদিদ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্র ও বস্তুতে অশুদ্ধি-আদি দ্বারা ও দক্ষিণাদিদ্বারা যে ছিদ্র বা অঙ্গহানি ঘটে, নাম-সঙ্কীর্ত্তনেই তৎসমস্ত নিশ্ছিদ্র হইতে পারে। “মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেহকালার্হবস্তুতঃ। সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নাম-সঙ্কীর্ত্তনং তব॥ শ্রীভা, ৮।২৩।১৬॥” স্কন্দপুরাণও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলেন – তপস্যা, যজ্ঞ এবং অন্যান্য ক্রিয়াও ভগবানের স্মরণ এবং নামোচ্চারণেই সম্পূর্ণতা লাভ করে। "যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু। ন্যূনং সম্পূর্ণতামেতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্॥ হ, ভ, বি, ১১।১৮১-ধৃত স্কান্দবচন॥" এমন কি, নববিধা ভক্তিও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে। "নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥ ২।১৫।১০৮॥"

(ড) **সর্ব্ব-বেদ হইতেও নামের মাহাত্ম্য অধিক।** "ঋগ্বেদো হি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ। অধীতা স্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥ হ, ভ, বি, ১১।১৮১॥ –যিনি 'হরি' এই দুইটী অক্ষর উচ্চারণ করেন, সেই উচ্চারণেই তাঁহার ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ অধীত হইয়া যায়।" স্কন্দপুরাণে দেখা যায়, শ্রীপার্ব্বতী বলিতেছেন—"মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন। গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৮২ ধৃত স্কান্দবচন॥ – বৎস! তুমি ঋক্, যজু ও সামবেদ পাঠ করিও না। শ্রীহরির 'গোবিন্দ' এই নামই গানযোগ্য; তুমি নিত্য সেই 'গোবিন্দ'-নাম গান কর।" পদ্মপুরাণও বলেন—"বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতম্। হ, ভ, বি, ১১।১৮৩-ধৃতবচন॥—বিষ্ণুর এক একটী নামও সমস্ত বেদ হইতে অধিক (মাহাত্ম্যযুক্ত)।"

(ঢ) **সর্ব্বতীর্থ হইতেও নামের মাহাত্ম্য অধিক।** স্কন্দপুরাণ বলেন—"কুরুক্ষেত্রেণ কি তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ বা। জিহ্বাগ্রে বসতে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥ হ, ভ, বি, ১১।১৮৪ ধৃতবচন॥—যাঁহার জিহ্বাগ্রে 'হরি' এই অক্ষর দুইটী বর্ত্তমান, তাঁহার কুরুক্ষেত্রেই বা কি প্রয়োজন? কাশী বা পুষ্করেই বা কি প্রয়োজন?" বামনপুরাণ বলেন—"তীর্থকোটিসহস্রাণি তীর্থকোটি শতানি চ। তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৮৪-ধৃতবচন॥ শতকোটি তীর্থ ই বল, আর সহস্রকোটি তীর্থ ই বল, বিষ্ণুর নামানুকীর্ত্তনেই লোক সে সমুদয়ই প্রাপ্ত হইতে পারে।" বিশ্বামিত্র-সংহিতা বলেন—"বিশ্রুতানি বহূন্যেব তীর্থানি বহুধানি চ। কোট্যংশেনাপি তুল্যানি নামকীর্ত্তনতো হরেঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৮৪-ধৃতবচন॥ – বহু প্রকার ও বহু সংখ্যক সুবিশ্রুত তীর্থসকল শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তনের কোটি অংশের এক অংশের তুল্যও নহে।"

(ণ) **সমস্ত সৎকর্ম্ম হইতেও নামের মাহাত্ম্য অধিক।** লঘুভাগবত বলেন—"গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগ-গঙ্গোদক-কল্পবাসঃ। যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তে র্ন সমং শতাংশৈঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৮৬ ধৃতবচন॥ - সূর্য্যগ্রহণসময়ে কোটি গোদান, প্রয়াগে গঙ্গার জলে কল্পবাস, অযুত যজ্ঞ, সুমেরুসদৃশ সুবর্ণদান—এসমস্ত শ্রীগোবিন্দনাম-কীর্ত্তনের শতাংশের একাংশ তুল্যও নহে।" বৌধায়ন-সংহিতাও বলেন—"ইষ্টাপূর্ত্তানি কর্ম্মাণি সুবহূনি কৃতান্যপি। ভবহেতূনি তান্যেব হরের্নাম তু মুক্তিদম্॥ হ, ভ, বি, ১১।১৮৭-ধৃতবচন॥—বহু বহু ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও তাহারা সংসার-বন্ধনেরই হেতু হইয়া থাকে; একমাত্র হরিনামই মুক্তিপ্রদ। (ইষ্টাপূর্ত্ত॥ অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চৈব পালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে॥ বাপীকূপ-তড়াগাদি দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥ অত্রিসংহিতা। ৪৩-৪৪॥ – অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্যনিষ্ঠা, বেদসমূহের আজ্ঞাপালন, আতিথ্য ও বিশ্বদেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান - এই সমস্তকে ইষ্ট বলে। বাপী, কূপ, তড়াগাদি জলাশয়ের উৎসর্গ, দেবমন্দির-প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও উপবনাদির উৎসর্গ – এই সমস্তকে পূর্ত্ত কহে)।

(ত) **নামের সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব।** দান, ব্রত, তপস্যা ও তীর্থযাত্রা প্রভৃতিতে, দেবতা ও সাধুদিগের সেবায় সর্ব্ব-পাপ-হারিণী যে সমস্ত মঙ্গলময়ী শক্তি আছে, রাজসূয় যজ্ঞ ও অশ্বমেধ যজ্ঞে, তত্ত্ব-জ্ঞানে এবং অধ্যাত্মবস্তুতে যে সমস্ত শক্তি আছে—তৎসমস্তকে শ্রীহরি স্বীয় নামসমূহেই স্থাপিত করিয়াছেন। "দান-ব্রত-তপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ। শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ। রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ। আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু॥ হ, ভ, বি, ১১।১৯৬-ধৃত স্কান্দবচন॥" সূর্য্য যেমন তমোরাশিকে বিদূরিত করে, তদ্রূপ শ্রীভগবন্নামের যথাকথঞ্চিৎ সম্বন্ধও ভয়ানক পাপরাশিকে বিদূরিত করিয়া থাকে। "বাতোঽপ্যাতো হরের্নাম্ন উগ্রাণামপি দুঃসহঃ। সর্ব্বেষাং পাপরাশীনাং যথৈব তমসাং রবিঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৯৭-ধৃত স্কান্দবচন॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(থ) নামের ভগবৎ-প্রীতিদায়কত্ব। ভগবন্নাম শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। সুরাপায়ী বা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিও যদি নিয়ত ভগবানের নামকীর্ত্তন করে, তাহা হইলেও ভগবান্ তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, সে ব্যক্তিও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। "বাসুদেবস্য সংকীর্ত্ত্যা সুরাপো ব্যাধিতোঽপি বা। মুক্তো জায়েত নিয়তং মহাবিষ্ণুঃ প্রসীদতি॥ হ, ভ, বি, ১১।২২৯-ধৃত বারাহ-বচন॥" বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের অত্যন্ত অভ্যাসবশতঃ ক্ষুধাতৃষ্ণাদিদ্বারা পীড়িত অবস্থাতেও বিবশতাবশতঃ যদি নামসঙ্কীর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলেও ভগবান্ কেশব প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। "নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্প্রস্খলিতাদিষু। যঃ করোতি মহাভাগ তস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।২৩০ ধৃত-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন॥" পরবর্ত্তী **ধ-অনুচ্ছেদ** দ্রষ্টব্য।

(দ) নামের ভগবদ্-বশীকারিত্ব। নামের ভগবদ্-বশীকারিণী শক্তির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (**ক**-অনুচ্ছেদ। পরবর্ত্তী **ধ**-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(ধ) নাম স্বতঃই পরম-পুরুষার্থ। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামীর ন্যায় নামও রসস্বরূপ, পরম মধুর। রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রাপ্তিতেই যেমন জীবের পরম-পুরুসার্থতা, তদ্রূপ নামের প্রাপ্তিতেই (অর্থাৎ নামের রসস্বরূপত্বের বা মাধুর্য্যের অপরোক্ষ অনুভূতিতেই) জীবের পরম-পুরুসার্থতা। নাম কেবল উপায়ই নহে, উপেয়ও বটে।

নাম মধুর হইতেও মধুর, সমস্ত মঙ্গলেরও মঙ্গল—নাম হইতেই সমস্ত মঙ্গলের আবির্ভাব; নাম সচ্চিদানন্দ-রসস্বরূপ; নামই হইতেছেন সকল-নিগম (উপনিষৎ)-রূপ কল্পলতিকার অত্যুৎকৃষ্ট ফল। "মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকল-নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্। সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥ হ, ভ, বি, ১১।২৩৪-ধৃত প্রভাসখণ্ড-বচন।" শ্রদ্ধা বা হেলার সহিতও যদি শ্রীকৃষ্ণনাম একবার কীর্ত্তিত হয়েন, তাহা হইলে নরমাত্রই উদ্ধার লাভ করিতে পারে।

"কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন; তার আগে ব্রহ্মানন্দ খাতোদক সম। ১।৭।৯৩॥" পরবর্ত্তী "চেতোদর্পণমার্জ্জনম্"-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

চিন্ময়-রসস্বরূপ নামের মাধুর্য্য ভগবানেরও লোভনীয়; তাই নাম-সঙ্কীর্ত্তনে তিনি পরমাতৃপ্তি লাভ করেন এবং কীর্ত্তনকারীর বশ্যতা পর্য্যন্ত স্বীকার করেন (পূর্ব্ববর্ত্তী **থ** ও **দ** অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(ন) নাম সর্ব্বমহাপ্রায়শ্চিত্ত। দ্বাদশাব্দাদিব্যাপী প্রায়শ্চিত্তদ্বারা কেবল পাপই নষ্ট হয়; কিন্তু সংস্কার নষ্ট হয় না। নাম সমস্ত পাপের মুলোৎপাটন করিয়া থাকে। তাই নামকীর্ত্তনের ফলে বর্ত্তমান এবং অতীত পাপ তো নষ্ট হয়ই, ভবিষ্যতের পাপও বিনষ্ট হয়। "বর্ত্তমানন্তু যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ ভবিষ্যতি। তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৫৬॥" অগ্নি যেমন সর্ব্ব-প্রকার ধাতুর মলিনতাকে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-নামেও সকল প্রকার পাপ বিনষ্ট ও নিঃশেষে সংশোধিত হইয়া থাকে। "যন্নামকীর্ত্তনং ভক্ত্যা বিলাপনমনুত্তমম্। মৈত্রেয়াশেসপাপানাং ধাতুনামিব পাবকম্॥ হ, ভ, বি, ১১।১৪১॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"দ্বাদশাব্দাদিপ্রায়শ্চিত্তৈঃ পাপমেব বিনশ্যতি তৎসংস্কারস্ত্ববশিষ্যতে ইদং তু অশেষাণাং সংস্কারাণাং পাপানাং বিলাপনং নাশকম্। ন চ অন্যেন নিঃশেষপাপক্ষয়ঃ স্যাৎ॥ অন্য কিছুতেই নিঃশেসরূপে পাপক্ষয় হয় না।" একবার মাত্র গোবিন্দ-নাম কীর্ত্তন করিলে দেহী যে শুদ্ধিলাভ করিতে পারে, পরাকব্রত, চান্দ্রায়ণ এবং তপ্তকৃচ্ছ্রসমূহের অনুষ্ঠানেও তাদৃশী শুদ্ধিলাভ হয় না। "পরাক-চান্দ্রায়ণ-তপ্তকৃচ্ছ্রৈর্ন দেহিশুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্। কলৌ সকৃন্মাধবকীর্ত্তনেন গোবিন্দনাম্না ভবতীহ যাদৃক্॥ হ, ভ, বি, ১১।১৬৪-ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন॥"

(প) নাম পরমধর্ম্ম। ভগবন্নাম গ্রহণাদিপূর্ব্বক ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানই জীবের পরম ধর্ম্ম। "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥ শ্রীভা, ৬।৩।২২॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উল্লিখিত কারণ-সমূহবশতঃই নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে **পরম-উপায়** বলা হইয়াছে। শ্রুতিও নামকে পরম উপায় বলিয়াছেন। "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ কঠ ১।২।১৭॥—নামই হইতেছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলম্বন (বা উপায়) এবং নামই পরম উপায়। এই নামকে জানিতে পারিলেই (নামের মহিমাদির অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করিলেই) জীব রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রেমসেবা লাভ করিয়া মহীয়ান্ হইতে পারে।"

এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"যত এবং অতএব এতদালম্বনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্ততমম্।—ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত রকম সাধন আছে, ব্রহ্মের বাচক নামের আশ্রয় গ্রহণই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, প্রশস্ততম।"

শ্রুতি বলিয়াছেন—"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায়; তাঁহার নিকটে যাওয়ায় (অয়নায়) আর অন্য নিশ্চিত পন্থা নাই।" নাম ও নামী যখন অভিন্ন, তখন ইহাও বলা যায়—নামকে জানিতে পারিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায় এবং নামীর চরণ-সান্নিধ্যেও উপনীত হওয়া যায়; ইহার আর অন্য কোনও নিশ্চিত পন্থা নাই। সুতরাং নামই পরম উপায়।

অথবা, ব্রহ্মকে জানার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইল ভক্তি। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ॥ গীতা॥ ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ। শ্রীভাগবত॥" আবার, ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং নাম-সঙ্কীর্ত্তনই হইল পরম উপায়।

নাম-সঙ্কীর্ত্তন—ভগবন্নামের সঙ্কীর্ত্তন। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিত্যাদি"-শ্রীভা, ১১।৫।৩, শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী সঙ্কীর্ত্তন-শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন। "সঙ্কীর্ত্তনং বহুভি র্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানম্—বহু লোক একত্রে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তনকে সঙ্কীর্ত্তন বলে।" আবার "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। ইত্যাদি শ্রীভা, ৭।৫।২৩ শ্লোকের টীকাতেও শ্রীজীব লিখিয়াছেন—নাম-কীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে করাই প্রশস্ত। "নামকীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্।"

সঙ্কীর্ত্তন-শব্দের আর একটী অর্থও হইতে পারে—সম্যক্ কীর্ত্তন। সম্যক্রূপে উচ্চারণ-পূর্ব্বক কীর্ত্তন। উচ্চ ভাষণই কীর্ত্তন। উচ্চস্বরে নামের সম্যক্ উচ্চারণই কীর্ত্তন। এই পয়ারে এইরূপ অর্থও প্রভুর অভিপ্রেত হইতে পারে; যেহেতু বহুলোক মিলিত হইয়া একত্রে নাম-কীর্ত্তনের সুযোগ সকল সময়ে না হইতেও পারে। এই পয়ারের বিবৃতিরূপে প্রভুও বলিয়াছেন—"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ ৩।২০।১৪॥" "খাইতে শুইতে যথা তথা" বহুলোক মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করা সম্ভব নয়। আবার শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও বলিয়াছেন—"ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে। নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিমর্দ্দনম্। কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ॥ ১১।২১৯॥" এস্থলে চলা-ফেরা কারার সময়ে, শয়নের সময়ে, ভোজনের সময়ে, শ্বাসগ্রহণের সময়েও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ নাম-সংকীর্ত্তন বহু-লোকের মিলিত নাম-সঙ্কীর্ত্তন হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না; উচ্চস্বরে উচ্চারণই এস্থলে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়।

উচ্চস্বরে নাম-উচ্চারণরূপ কীর্ত্তনে অপরের সেবা করাও হয়; স্থাবর-জঙ্গমাদি সেই নাম শুনিয়া ধন্য হইতে পারে—ইহাই নাম-কীর্ত্তনকারীর পক্ষে তাহাদের সেবা। অধিকন্তু উচ্চস্বরে উচ্চারিত নাম উচ্চারণকারীর নিজের কর্ণেও প্রবেশ করিতে পারে এবং তাহার চিত্তেও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, জিহ্বাকেও সংযত করিতে পারে। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতও একথাই বলেন। "মন্যামহে কীর্ত্তনমেব সত্তমং লীলাত্মকৈকস্বহৃদি স্ফুরৎস্মৃতেঃ। বাচি স্বযুক্তে মনসি শ্রুতৌ তথা দীব্যৎ পরানপ্যুপকুর্ব্বদাত্মবৎ॥ ২।৩।১৪৮॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রতিদিন এক লক্ষ নাম উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। বেণাপোলের জঙ্গলে নির্জ্জন কুটীরে তিনি একাকীই নাম কীর্ত্তন করিতেন। এই কীর্ত্তনকেও সঙ্কীর্ত্তন বলা হইয়াছে; রামচন্দ্রখানের প্রেরিত বেশ্যাকে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—"তাবৎ ইহাঁ বসি শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন। নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন॥ ৩।৩।১১৩॥" এইরূপ কীর্ত্তনকে আবার "কীর্ত্তনও" বলা হইয়াছে। "কীর্ত্তন করিতে তবে রাত্রি শেষ হৈল॥ ৩।৩।১২২॥" শান্তিপুরে গঙ্গাতীরের নির্জ্জন গোঁফাতে বসিয়া একাকী হরিদাস ঠাকুর যে উচ্চস্বরে নাম করিতেছিলেন, তাহাকেও সঙ্কীর্ত্তনই বলা হইয়াছে; তাঁহার নিকটে উপস্থিত মায়াদেবীকে তিনি বলিয়াছেন—"সংখ্যানাম-সঙ্কীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ মন্তে॥ ৩।৩।২২৭॥" ইহাকে আবার কীর্ত্তনও বলা হইয়াছে। "কীর্ত্তন-সমাপ্তি হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥ ৩।৩।২২৮॥" হরিদাসের নির্য্যানের প্রাক্‌কালে গোবিন্দ যখন মহাপ্রসাদ লইয়া তাঁহার নিকটে গিয়াছিলেন, তখন তিনি "দেখে—হরিদাস করি আছে শয়ন। মন্দ মন্দ করিতেছে নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥ ৩।১১।১৬॥" এস্থলে "মন্দ মন্দ"-শব্দে মনে হয়, হরিদাস ঠাকুর উচ্চস্বরে নাম করিতেছিলেন না, তবে স্পষ্ট ভাবে (সম্যক্‌রূপে) উচ্চারণ করিতেছিলেন; তথাপি ইহাকে "নাম-সঙ্কীর্ত্তন" বলা হইয়াছে।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও উচ্চস্বরে তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীপাদরূপগোস্বামীর বিরচিত স্তবমালা হইতে তাহা জানা যায়। "হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনঃ"-ইত্যাদি। ইহার টীকায় বিদ্যাভূষণপাদ লিখিয়াছেন—"হরেকৃষ্ণেতি মন্ত্রপ্রতীকগ্রহণম্। ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণ উচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতনৃত্যা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ।" এই টীকা হইতে বুঝা যায়—প্রভু ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর তারকব্রহ্ম নামই উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। মহাপ্রভু সংখ্যারক্ষণ পূর্ব্বক নামকীর্ত্তন করিতেন।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—নামের সুস্পষ্ট উচ্চারণ পূর্ব্বক উচ্চস্বরে, অন্ততঃ নিজের শ্রুতিগোচর হয় এমন ভাবে, শ্রীহরি-নামের একাকী কীর্ত্তনও সঙ্কীর্ত্তন নামে অভিহিত। মহাপ্রভু যখন কলির সকল জীবের জন্যই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন কেবল যে বহুলোকের একত্রে মিলিত ভাবের সঙ্কীর্ত্তনের কথাই বলিয়াছেন, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর আদির ন্যায় একাকী কীর্ত্তনের উপদেশ দেন নাই, তাহা মনে হয় না। বহুলোক একত্রিত হইয়াও নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিবে, একাকীও করিবে—ইহাই প্রভুর অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। একাকীও উচ্চস্বরে—অন্ততঃ নিজের কানেও শুনা যায়, এই ভাবে—নামকীর্ত্তন করিলে নামের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী; তাহাতে নিজের কীর্ত্তিত নামই শুনা যায়, অন্য শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিবার সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া যায়। অবশ্য মনোযোগ-বিহীন নাম-কীর্ত্তনও পাপাদি দূরীভূত করিতে পারে, মুক্তিও দিতে পারে; কিন্তু তাহাতে প্রেম লাভের সম্ভাবনা কম। যাহাতে হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে, সেই ভাবে নামকীর্ত্তনের উপদেশই প্রভু দিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীজীবগোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—নামকীর্ত্তন উচ্চস্বরে করাই প্রশস্ত; "নামকীর্ত্তনঞ্চেদ-মুচ্চৈরেব প্রশস্তম্।" ইহা হইতে বুঝা যায় - অনুচ্চ-স্বরে নামকীর্ত্তনের বিধানও আছে, (যদিও তাহা শ্রীজীবের মতে প্রশস্ত নহে)। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে নামকীর্ত্তনের ভূয়সী প্রশংসার পরে "নাম-জপের" এবং "নাম-স্মরণের" মাহাত্ম্যও দৃষ্ট হয়। "অথ শ্রীভগবন্নামজপস্য স্মরণস্য চ। শ্রবণস্যাপি মহাত্ম্যমীষদ্‌ভেদাদ্বিলিখ্যতে॥ হ, ভ, বি, ১১।২৪৭॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"এবং নাম্নাং কীর্ত্তনমাহাত্ম্যং লিখিত্বা জপাদি-মাহাত্ম্য-লিখনমপি প্রতিজানীতে অথেতি। ঈষদ্‌ভেদাৎ কীর্ত্তনেন সহ জপাদেরল্পভেদাৎ হেতো র্বিশেষেণ লিখ্যতে। তত্রাগ্রে লেখ্যস্য বাচিকোপাংশুমানসিকভেদেন ত্রিবিধজপস্য মধ্যে ঈষদোষ্ঠচালনেন শনৈরুচ্চারণরূপোপাংশুজপোহত্র গ্রাহ্যঃ, বাচিকস্য কীর্ত্তনান্তর্গতত্বাৎ মানসিকস্য চ স্মরণাত্মকত্বাৎ। ক্বচিচ্চ নাম্নঃ স্মরণং শনৈরীষদুচ্চারণং জ্ঞেয়ম্॥" মূল শ্লোক এবং টীকার তাৎপর্য্য এইরূপ:—নাম-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য লিখিয়া এক্ষণে নাম-জপের, নাম-স্মরণের এবং নাম-শ্রবণের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে। কীর্ত্তন হইতে জপাদির অল্প কিছু ভেদ আছে। পরে (দীক্ষা-মন্ত্রের পুরশ্চরণ-প্রসঙ্গে) যে বাচিক, উপাংশু এবং মানসিক, এই তিন রকম জপের কথা লিখিত হইবে, তন্মধ্যে কেবল উপাংশু জপই এস্থলে গ্রহণীয়; (এই মূল শ্লোকে জপ-শব্দে বাচিক এবং মানসিক জপকে বুঝাইবে না) যেহেতু, বাচিক-জপ কীর্ত্তনের অন্তর্গত এবং মানসিক জপ স্মরণাত্মক। কোনও কোনও স্থলে আস্তে আস্তে নামের ঈষৎ উচ্চারণকে স্মরণ বলা হয়।

পুরশ্চরণ-প্রকরণে মন্ত্রের যে তিন রকম জপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাদের পরিচয় এইরূপ। যে জপে, উচ্চ, নীচ ও স্বরিত (উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত) নামক স্বরযোগে সুপরিস্কৃত অক্ষরে স্পষ্টভাবে মন্ত্র উচ্চরিত হয়, তাহাকে বলে বাচিক জপ (হ, ভ, বি, ১৭।৭৩)। যে জপে মন্ত্রটী ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয়, ওষ্ঠ কিঞ্চিন্মাত্র চালিত হইতে থাকে এবং মন্ত্রটী কেবল নিজেরই শ্রুতিগোচর হয়, তাহাকে বলে উপাংশু জপ। (হ, ভ, বি, ১৭।৭৪)। আর নিজ-বুদ্ধিযোগে মন্ত্রের এক অক্ষর হইতে অন্য অক্ষরের এবং একপদ হইতে অন্য পদের যে চিন্তন এবং তাহার অর্থের যে চিন্তন, তাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকে বলে মানসিক জপ (হ, ভ, বি, ১৭।৭৫)। মানস-জপ ধ্যানেরই (বা স্মরণেরই) তুল্য (হ, ভ, বি, ১৭।৭৬)। বাচিক জপ অপেক্ষা উপাংশু জপ শতগুণে এবং মানস-জপ সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। "উপাংশুজপযুক্তস্য তস্মাচ্ছতগুণো ভবেৎ। সহস্রো মানসঃ প্রোক্তো যস্মাদ্ধ্যানসমো হি সঃ॥ হ, ভ, বি, ১৭।৭৬॥"—টীকা, "উপাংশুজপযুক্তস্য জপঃ শতগুণঃ স্যাদ্‌বাচিকাজ্জপাৎ শতগুণো ভবেদিত্যর্থঃ॥" বাচিক জপ অপেক্ষা উপাংশু জপের যে অধিক মাহাত্ম্যের কথা এস্থলে লিখিত হইয়াছে, তাহা দীক্ষা-মন্ত্রের পুরশ্চণের অঙ্গীভূত যে দীক্ষামন্ত্রের জপ, তৎসম্বন্ধেই লিখিত হইয়াছে।

যাহা হউক, শ্রীশ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে ভগবন্নামের যে জপের কথা বলা হইয়াছে, শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর মতে তাহা হইতেছে—নামের উপাংশু জপ; ওষ্ঠের ঈষৎ-চালনা পূর্ব্বক, নিজের শ্রুতিগোচর হয়, এমনভাবে, ধীরে ধীরে নামের কীর্ত্তন; অবশ্য ইহা উচ্চকীর্ত্তন নহে। নাম-কীর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী উচ্চকীর্ত্তনেরই সমধিক প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া বুঝা যায়—উপাংশুকীর্ত্তন হইতেও উচ্চকীর্ত্তন প্রশস্ততর। পুরশ্চরণ-প্রকরণে যে বাচিক-জপ (উচ্চ কীর্ত্তন) অপেক্ষা উপাংশু জপের অধিক মাহাত্ম্যের কথা দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে—কেবল পুরশ্চরণের অঙ্গীভূত দীক্ষামন্ত্রজপের সম্বন্ধে; নামজপের সম্বন্ধেও তাহার প্রয়োগ করিতে গেলে শ্রীজীবের উক্তির সহিত, শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতের উক্তির সহিত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীপাদ হরিদাস ঠাকুরের আচরণের সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ, ভগবন্নাম-জপের মাহাত্ম্য-কথন-প্রসঙ্গে উচ্চকীর্ত্তন অপেক্ষা উপাংশু-জপের মাহাত্ম্য যে অধিক, একথাও শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয় না।

উচ্চ নাম-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যাধিক্যের হেতুও আছে। দীক্ষামন্ত্রের ন্যায় ভগবন্নাম বিষয়েও হয়তো মানস জপ বা স্মরণের সমধিক মাহাত্ম্য থাকিতে পারে; কিন্তু যাঁহার চিত্ত স্থির হয় নাই, তাঁহার পক্ষে মানস-জপ সহজ-সাধ্য নহে। ইতঃপূর্ব্বে (ঘ-অনুচ্ছেদে) বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও জানা যায়, নামের বাচিক-জপের (উচ্চ কীর্ত্তনের) অভ্যাসেই মানস-জপ (বা স্মরণ) সুগম হইতে পারে। চঞ্চল-চিত্ত লোক মানস-জপ আরম্ভ করিলে মন কখন যে কোথায় ছুটিয়া যায়, তাহাও সহসা টের পাওয়া যায় না। বাহিরের অন্য কথা বা অন্য শব্দও কর্ণে প্রবেশ করিয়া মনকে অন্যদিকে লইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু উচ্চস্বরে যদি নাম-কীর্ত্তন (বাচিক জপ) করা যায়, কর্ণে অন্য শব্দ সহজে প্রবেশ করিতে পারেনা, করিলেও মন যে অন্যত্র ছুটিয়া যাইতেছে, তাহা অপেক্ষাকৃত সহজে টের পাওয়া যায়; তখনই মনকে সংযত করা সম্ভব হইতে পারে। এসমস্ত কারণেই শ্রীজীবগোস্বামীও বলিয়াছেন—"নামকীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্।" (পরবর্ত্তী "বাগিন্দ্রিয়ই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক" শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

বিষয়-মলিন-চিত্ত জীবের মন নামে বসিতে চায়না; তজ্জন্য তীব্র অভ্যাসের প্রয়োজন। মন না বসিলেও প্রত্যহ কিছুকাল নাম-কীর্ত্তনের অভ্যাস করা আবশ্যক। এই অভ্যাসটীকে ব্রতরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এজন্য

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রত্যেকদিনই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নামের কীর্ত্তন প্রশস্ত। এজন্য শ্রীহরি-নামের মালা আদিতে সংখ্যা রাখিয়া নাম-কীর্ত্তন করার বিধি। শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর ব্রতরূপে সংখ্যা-নাম কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও সেই আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। এইরূপ না করিলে সকল দিন নাম-গ্রহণ হইয়া উঠে না। নাম-গ্রহণে প্রথমতঃ আনন্দ না পাইলেও সংখ্যা-নাম প্রত্যহ কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য; নচেৎ শৈথিল্য আসিবে, ভজনে অগ্রসর হওয়া যাইবে না। ক্রমশঃ নামের কৃপাতেই চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হইবে, তখন নামের মাধুর্য্য অনুভূত হইবে; পিত্তদুষ্ট জিহ্বায় মিশ্রিও তিক্ত বলিয়া মনে হয়; পিত্ত-দোষ দূর করার ঔষধও মিশ্রীই। ঔষধ-রূপে মিশ্রী খাইতে খাইতে যখন পিত্তদোষ কাটিয়া যাইবে, তখন মিশ্রীর মিষ্টত্ব অনুভব হইবে।

মিশ্রী মিষ্ট বটে; কিন্তু যাহার পিত্তদোষ নাই, সে-ব্যক্তিও যদি জিহ্বার উপরে ক্ষুদ্র এক খণ্ড কলাপাতা বিছাইয়া তাহার উপরে এক টুকরা মিশ্রী রাখে, তাহা হইলে মিশ্রীর মিষ্টত্ব বুঝা যাইবে না; জিহ্বার সঙ্গে মিশ্রীর সংযোগ না হইলে মিষ্টত্বের অনুভব হইতে পারে না। মায়াবদ্ধ জীবের জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়েও মায়ামলিনতারূপ কলাপাতার আবরণ আছে, তাই পরম-মধুর শ্রীকৃষ্ণনাম ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হইলেও তাহার মাধুর্য্যের অনুভব হয় না। এই আবরণ দূর করার উপায়ও নাম-সংকীর্ত্তনই; নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মায়ামলিনতারূপ কলাপাতা অপসারিত হইলেই নামরূপ মিশ্রীর মাধুর্য্য অনুভূত হইবে। রোগ দূর করার জন্য রোগীকে যেমন জোর করিয়াও ঔষধ খাওয়াইতে হয়, তদ্রূপ ভবরোগ দূর করার জন্যও নামরূপ ঔষধ সেবন করা একান্ত আবশ্যক। ২।২২।৭৪-পয়ারের টীকায় "নাম-সঙ্কীর্ত্তন" দ্রষ্টব্য।

প্রত্যহ নিয়মিত-সংখ্যক নাম-কীর্ত্তনের পরেও নাম করা যায়। এই অতিরিক্ত নামও সংখ্যারক্ষণ পূর্ব্বক করিতে পারিলেই ভাল। "খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"-এই উক্তি হইতে বুঝা যায়—সংখ্যানাম-গ্রহণের পরে অসংখ্যাত নামকীর্ত্তনও অবৈধ নহে; যেহেতু, খাওয়ার সময়ে এবং যেখানে সেখানে সংখ্যা রাখিয়া নামকীর্ত্তন সম্ভব নয়।

নাম-মন্ত্র। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥ ১।৭।৭২॥" সর্ব্বমন্ত্র সার বলিয়া শ্রীভগবন্নাম হইল "মহামন্ত্র।" শ্রীমন্‌মহাপ্রভু স্পষ্ট কথাতেও কৃষ্ণনামকে "মহামন্ত্র" বলিয়াছেন—"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব। ১।৭।৮০।" স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অনেক নাম; তাঁহার প্রত্যেকটী নামই মহামন্ত্র, সকল নামেরই সমান প্রভাব (৩।২০।১৫-পয়ারের টীকায় "সকল নামের সমান মাহাত্ম্য"-শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য)। কেবল কোনও একটী বিশেষ নাম, বা কোনও বিশেষ নাম-সমূহই যে মহামন্ত্র, তাহা নহে; এরূপ কথা শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কোথাও বলেন নাই। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামী যেমন মহান্ বস্তু বা ব্রহ্ম, নামও তদ্রূপ মহদ্ বস্তু বা ব্রহ্ম।

দীক্ষা-মন্ত্রাদি সাধারণতঃ অন্যের শ্রুতিগোচর ভাবে উচ্চারণের নিয়ম নাই; কিন্তু নামরূপ মহামন্ত্রের উচ্চকীর্ত্তনই প্রশস্ত বলিয়া গোস্বামিপাদগণ বলিয়া গিয়াছেন; অন্য মন্ত্র অপেক্ষা নামরূপ মহামন্ত্রের ইহাই এক বৈশিষ্ট্য। অপরাপর বৈশিষ্ট্যও আছে। অন্য মন্ত্রে দীক্ষার প্রয়োজন, পুরশ্চরণের প্রয়োজন; কিন্তু শ্রীনাম "দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে। ২।১৫।১০৯॥" দীক্ষা-মন্ত্রের জপে স্থান-আসনাদির এবং শৌচাশৌচ-বিধানাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়; নামরূপ মহামন্ত্রের কীর্ত্তনাদিতে তদ্রূপ কোনও কিছু নাই। এইরূপ আরও বৈশিষ্ট্য আছে। "মহামন্ত্র" বলিয়াই শ্রীনামের এ-সকল বৈশিষ্ট্য; নামীরই ন্যায় শ্রীনাম পরম-স্বতন্ত্র; তাই নাম কোনওরূপ বিধি-নিষেধের অধীন নহেন।

কোনও বিশেষ নামের বা বিশেষ নাম-সমূহেরই উচ্চকীর্ত্তন প্রশস্ত, কোনও বিশেষ নামের বা নাম-সমূহের উচ্চকীর্ত্তন প্রশস্ত নহে—এইরূপ কোনও কথাও শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বা শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলেন নাই।

বাগিন্দ্রিয়ই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক। বৃহদ্ভাগবতামৃতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বাগিন্দ্রিয়ই অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক এবং বাগিন্দ্রিয় সংযত হইলেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় সংযত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল গৌরগোবিন্দ ভাগবতস্বামী মহোদয় তাঁহার "সাধন-কুসুমাঞ্জলি"-গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এইরূপঃ—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"অগ্নি র্বৈ বাগ্‌ ভূত্বা প্রাবিশৎ"-এই একটী শ্রুতিবাক্য আছে। এই শ্রুতির অর্থ এই যে, জীবের মনুষ্যাদি দেহে যে বাগিন্দ্রিয়টী আছে, তাহা অগ্নিই। এই বাক্‌রূপী অগ্নি শারীরিক প্রাণাগ্নিরই অংশ। আমাদের বাগিন্দ্রিয়-ব্যাপারে প্রাণশক্তিরই প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। বাগ্‌বিশৃঙ্খলায় অর্থাৎ অপরিমিত বাক্‌চালনায় শরীর যেমন দুর্ব্বল হয়, মন যত বিক্ষিপ্ত হয় এবং প্রাণের গতি অসমান ও অস্বাভাবিক হওয়ায় যত বিশৃঙ্খলা হয়, তত দুর্ব্বল, বিক্ষিপ্ত এবং বিশৃঙ্খল অন্য কাহারও চালনায় সহজে হয় না। আবার এই অগ্নিরূপী বাগিন্দ্রিয়ের যথাযোগ্য পরিচালনা দ্বারাই প্রাণের অসমান গতি রহিত হইয়া স্বাভাবিক শৃঙ্খলতা প্রাপ্তি হয়। বাচিক জপদ্বারা ক্রমশঃ বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নি পুষ্টিলাভ করিয়া প্রাণশক্তিকেই বর্দ্ধিত করে। এই অভিপ্রায়ে যোগসাধনের মধ্যে প্রথমেই "যম"-নামক সাধনে মৌনাবলম্বনটী বিহিত হইয়াছে। মৌনাবলম্বনে প্রাণাগ্নির ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়। * *। কিন্তু শুদ্ধ মৌনব্রত হইতেও বাচিক জপ অধিকতর শ্রেয়ঃ এবং প্রাণের অত্যধিক হিতকর। শুদ্ধ মৌনব্রতে কেবলমাত্র বাগিন্দ্রিয়ের ব্যয় রহিত হয় বটে; কিন্তু এই প্রকার মৌনে ক্রমশঃ প্রাণাগ্নি বর্দ্ধিত হইলেও উপযুক্ত আহার্য্য না পাইয়া স্বচ্ছ উজ্জ্বল হইতে পারে না। এইজন্য যোগশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গ-যোগ-সাধনার মধ্যে "নিয়ম"-নামক সাধনের মধ্যে "স্বাধ্যায়" এবং জপের দ্বারা পরিমিত বাগিন্দ্রিয় চালনার ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। জপই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বাধ্যায়। জপই প্রাণাগ্নির পুষ্টিকর আহার্য্য। * * ঈষদুচ্চারিত জপের দ্বারা প্রাণাগ্নিতে যথাযোগ্য পরিমিত আহুতি দানের কার্য্য হইতে থাকায় সেই প্রাণাগ্নি হ্রাস পাইতে পারে না, বরং পরিমিত আহুতি পাইয়া অগ্নি যেমন উজ্জ্বল বীর্য্যশালী হয়, সাধকের প্রাণাগ্নিও তেমন উজ্জ্বল বীর্য্যশালী হইয়া উঠিতে থাকে। (৮৬-৮৭ পৃঃ)।

প্রাণাগ্নিই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে ব্যাপিয়া আছে। বাক্‌, চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয় সমূহের বৃত্তি অর্থাৎ স্থিতি-ব্যাপারাদি এক প্রাণেরই অধীন। "প্রাণো হ্যেবাতানি সর্ব্বাণি ভবতি"—এই শ্রুতির প্রমাণে সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাণই। বাচিক জপ দ্বারা প্রাণাগ্নিরই সাধন হয়; ফলে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের স্থিতি-ব্যাপারাদির উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল গতি তিরোহিত হইয়া সমস্ত কেন্দ্রগত হইতে থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গ স্বচ্ছ হইয়া স্বাভাবিক গতিতে মনের সহিত স্থির হয় এবং প্রাণের অনুগতই হয়। ৮৭ পৃঃ।"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা গেল—প্রাণাগ্নিই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে ব্যাপিয়া আছে; বাগিন্দ্রিয়ও সেই প্রাণাগ্নিরই অংশ; আবার বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপারেই প্রাণশক্তির ক্রিয়া প্রধানরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং এই বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নি (তেজঃ বা শক্তি) সংযত ও সুশৃঙ্খল ভাবে পুষ্টিলাভ করিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়স্থ অগ্নিও সংযত ও সুশৃঙ্খল ভাবে পুষ্টিলাভ করিতে পারে; বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নি অসংযত ও বিশৃঙ্খল হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়স্থ অগ্নিও তদ্রূপ হইবে; যেহেতু, এক প্রাণাগ্নিই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ব্যাপিয়া আছে; এই অগ্নির প্রধান ক্রিয়াস্থল বাগিন্দ্রিয় হইতে এই অগ্নি যে রূপ লইয়া বিকশিত হইবে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়কেও তদনুরূপ ভাবেই প্রভাবান্বিত এবং পরিচালিত করিবে। এজন্য বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নিকেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়স্থিত অগ্নির পরিচালক এবং তজ্জন্য বাগিন্দ্রিয়কেও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পরিচালক বলা যায়। সুতরাং এই বাগিন্দ্রিয় সংযত হইলেই সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত হইতে পারে।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে ইহাও জানা গেল—বাচিক জপের দ্বারাই বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নি সংযত ও সুশৃঙ্খল ভাবে পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে; সুতরাং ঐ বাচিক জপের দ্বারা অন্যান্য ইন্দ্রিয়স্থ অগ্নিও পুষ্টিলাভ করিতে পারে। এইরূপে দেখা গেল, বাগিন্দ্রিয় সংযত হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও সংযত হইতে পারে। বাচিক জপ বা নাম-কীর্ত্তনই তাহার শ্রেষ্ঠ উপায়।

কলৌ—কলিকালে। কলিযুগে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই হইতেছে পরম উপায়। প্রশ্ন হইতে পারে, সত্যত্রেতাদি যুগে কি নাম-সঙ্কীর্ত্তন পরম উপায় নয়? উত্তরে বলা যায়—নাম ও নামীর অভিন্নতা যখন নিত্য, তখন নামের মাহাত্ম্যও নিত্য; সকল যুগেই নাম পরম উপায়। তথাপি কলিযুগে যে নামকে পরম উপায় বলা হইয়াছে, তাহা

সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন। | সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কেবলমাত্র নামের মাহাত্ম্যের দিকে দৃষ্টি করিয়াই নয়, কলি-জীবের অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিয়াও। কলির জীব হীনশক্তি, অল্পায়ুঃ; তাহার দেহাবেশও অত্যন্ত গাঢ় এবং তজ্জন্য ইন্দ্রিয়-লালসাও অত্যন্ত বলবতী; সংযমেরও অত্যন্ত অভাব। সত্যত্রেতাদি যুগের জীবের অবস্থা কলিজীবের অবস্থা হইতে উন্নততর। কলিজীবের ভবরোগ যেমন অত্যন্ত সাংঘাতিক, তাহার প্রতীকারের জন্য তেমনি অমোঘ ঔষধেরই প্রয়োজন। নাম-সঙ্কীর্ত্তনই হইতেছে এই অমোঘ ঔষধ। হেলায় হউক, শ্রদ্ধায় হউক, যে কোনও রূপে নাম উচ্চারণ করিতে পারিলেই যখন ভবরোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তখন নামই হইতেছে অসংযত চিত্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত দুর্ব্বল কলিজীবের পক্ষে প্রকৃষ্ট ঔষধ। অন্য সাধনে একটু চিত্তসংযমের প্রয়োজন, বিশেষতঃ অন্যসাধন নামসঙ্কীর্ত্তনের মত শক্তিশালীও নহে। তাই তাহা কলিজীবের পক্ষে সহজসাধ্যও নহে। অপর অনেক সাধনে বিধি নিষেধের অপেক্ষাও আছে; কিন্তু কেবল ভবরোগ হইতে মুক্তি লাভের জন্য নাম-সঙ্কীর্ত্তনে কোনও বিধি-নিষেধেরও অপেক্ষা নাই। কলিজীবের বহির্ম্মুখতা অত্যন্ত নিবিড়, বিধি-নিষেধের কথাতেই তাহার ভয় পাওয়ার কথা। তাহার পক্ষে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ উপায়। কোনও কোনও কলিজীব ভগবানের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে চায় না। তাহাদের পক্ষেও নাম-সঙ্কীর্ত্তনই হইতেছে অমোঘ উপায়। এজন্যই বলা হইয়াছে—"হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥" কলির অনেক দোষ আছে সত্য; কিন্তু একটী মহাগুণও আছে; তাহা হইতেছে এই যে—শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিয়াই জীব সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমধামে যাইতে পারে। "কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥ শ্রীভা, ১২।৩।৫১॥" এই গুণেতে চতুর্যুগের মধ্যে কলিযুগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া গুণগ্রাহিগণ তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥ শ্রীভা, ১১।৫।৩৬॥" কলিযুগে কেবলমাত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তনেই সমস্ত অভীষ্ট লাভ হইতে পারে।

কলিযুগের নাম-সঙ্কীর্ত্তনের এই বৈশিষ্ট্যের হেতু হইতেছে এই যে, কলিকালে ভগবান্ নিজেই নাম প্রচার করিয়া থাকেন (২।৯।১৮ শ্লোকের টীকায় "নাম-সঙ্কীর্ত্তন" এ বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

কলিযুগে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে—"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার ॥ ১।১৭।১৯ ॥"

৮। **যজ্ঞ**—যজ্-ধাতু হইতে যজ্ঞ-শব্দ নিষ্পন্ন; যজ্ ধাতুর অর্থ পূজা করা (বা দেবার্চ্চনে দান করা) এবং সঙ্গ করা; যজ্ দেবার্চ্চাদানি-সঙ্গকৃতৌ; সঙ্গস্য-কৃতিঃ সঙ্গকৃতিঃ (শব্দ-কল্পদ্রুম)। যজ্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে নঙ্ প্রত্যয় করিয়া যজ্ঞ-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে যজ্ঞ-শব্দের অর্থ হইল—পূজাকরণ বা সঙ্গ-করণ।

সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ—নাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা পূজাকরণ; নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ উপচারদ্বারা ইষ্টদেবতার (প্রীত্যর্থ) পূজাকরণ। অথবা, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গ-করণ; সর্ব্বদা সঙ্কীর্ত্তন করণ। অথবা, সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ (যজন); নাম-সঙ্কীর্ত্তনই যজ্ঞ (যজন বা পূজা)। **কৃষ্ণ-আরাধন**—শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা।

কলিযুগে শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবার বিধি শাস্ত্রবিহিত। সর্ব্বদা শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিলেই শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হয়েন এবং প্রীত হইয়া সাধকের সমস্ত অনর্থ দুর করিয়া তাহাকে প্রেমদান করেন এবং প্রেম দিয়া স্বীয় চরণ-সেবা দান করেন।

সুমেধা—সুবুদ্ধি ব্যক্তি।

সেই ত সুমেধা—যিনি সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তনকারীকে সুমেধা (সুবুদ্ধি) বলা হইয়াছে। ইহার ধ্বনি এই যে, যাহারা শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিতে প্রয়াস পায়, তাহারা সুমেধা নহে—পরন্তু কুমেধা

তথাহি (ভাঃ ১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ২

নামসঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥ ৯

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (২২)—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

চেত ইতি। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং কৃষ্ণগোবিন্দেতিনামোচ্চারণং পরং সর্ব্বোৎকর্ষং বিজয়তে। কথম্ভূতং কীর্ত্তনম্? চেতোদর্পণমার্জ্জনং চিত্তরূপদর্পণস্য মলাপকর্ষণম্। পুনঃ কীদৃশম্? ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্ সংসাররূপবনাগ্নিনাশনম্। পুনঃ কীদৃশম্? শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্ মঙ্গলরূপ-কৌমুদী-জ্যোৎস্নাবিস্তারিতশীলম্। পুনঃ কীদৃশম্? বিদ্যা-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(কুবুদ্ধি)। আদির ৩য় পরিচ্ছেদেও এ কথা বলা হইয়াছে :—"সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে—সে-ই ধন্য॥ সে-ই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার। সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণ-নাম-যজ্ঞ সার॥ ১।৩।৬২—৬৩॥"

সেই ত ইত্যাদি—যিনি নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা পায়েন। ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত "কৃষ্ণবর্ণং" ইত্যাদি শ্লোক।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৩।১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান কলির উপাস্যের স্বরূপ এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে তাঁহার উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। সেই উপাস্য হইতেছেন—"কৃষ্ণবর্ণ-ত্বিষাকৃষ্ণ-সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ", "রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ", মহাভাব-স্বরূপিণী গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার প্রতি গৌর অঙ্গদ্বারা স্বীয় প্রতি শ্যাম অঙ্গে আলিঙ্গিত গোপেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপ, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। আর, তাঁহার উপাসনার প্রধান এবং মুখ্য অঙ্গ হইতেছে—নাম-সঙ্কীর্ত্তন। এই শ্লোকে ইহাও সূচিত হইতেছে যে—নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপাসনার দ্বারাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-সেবা পাওয়া যায় এবং মদনমোহনরূপের মাধুর্য্যের আস্বাদন-জনিত আনন্দোন্মাদনাও যিনি সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই রায়-রামানন্দও যে মাধুর্য্যাস্বাদন-জনিত আনন্দোন্মাদনা সম্বরণ করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সেই সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্যের আস্বাদন লাভের সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে।

ইহাও সূচিত হইতেছে যে—নাম-সঙ্কীর্ত্তন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরেরও অত্যন্ত লোভনীয় ; তিনি ইহাতে পরমা তৃপ্তি লাভ করেন ; তাই নাম-সঙ্কীর্ত্তনই হইতেছে তাঁহার উপাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। ইহাদ্বারা শ্রীনামের পরম-মাধুর্য্যই ধ্বনিত হইতেছে।

৮-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৯। **সর্ব্বানর্থ**—সকল প্রকার অনর্থ। অনর্থসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ২।২২।৩৬ টীকায় দ্রষ্টব্য। **সর্ব্বানর্থনাশ**—সর্ব্ববিধ অনর্থের নাশ। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে সকল প্রকার অনর্থ দূরীভূত হয়। **সর্ব্বশুভোদয়**—সকল প্রকার মঙ্গলের (শুভের) উদয় হয় যাহা হইতে। ইহা কৃষ্ণপ্রেমের বিশেষণ। **সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেম**—সকল প্রকার মঙ্গলের উদয় হয় যাহা হইতে, সেই কৃষ্ণপ্রেম। শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই জীবের সর্ব্ববিধ মঙ্গলের পর্য্যবসান ; কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইলেই এই শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় ; তাই কৃষ্ণপ্রেমকে সর্ব্বশুভোদয় (সমস্ত মঙ্গলের নিদান) বলা হইয়াছে। **উল্লাস**—বিকাশ, সম্যক্ অভিব্যক্তি। **কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস**—সর্ব্ববিধ বৈচিত্রীর সহিত কৃষ্ণপ্রেমের অভিব্যক্তি। **সর্ব্ব-শুভোদয়** ইত্যাদি—জীবের সর্ব্ববিধ-মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই পর্য্যবসিত ; যে প্রেমের দ্বারা সর্ব্বমঙ্গলময়ী শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যাইতে পারে, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবেই সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম নিজের সমস্ত বৈচিত্রীর সহিত অভিব্যক্ত হয়। নাম-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলমঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।"

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বধূজীবনম্ বিদ্যারূপা বধূ তস্যাঃ প্রাণম্। পুনঃ কীদৃশম্? আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম্ আনন্দরূপসমুদ্রস্য বৃদ্ধিকরণম্। পুনঃ কীদৃশম্? প্রতিপদং পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনম্ সকলরসাস্বাদনকারণম্। পুনঃ কীদৃশম্? সর্ব্বাত্মস্নপনম্ মন আদীন্দ্রিয়-গণতৃপ্তিজনকশীলম্। শ্লোকমালা। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। যাহা চিত্তরূপ-দর্পণকে মার্জ্জিত করে (যাহা দ্বারা চিত্তের দুর্ব্বাসনা সমূহ দূরীভূত হয়), যাহা সংসার-তাপ-রূপ মহাদাবানলকে নির্ব্বাপিত করে, যাহা মঙ্গলরূপ কৌমুদীকে জ্যোৎস্না বিতরণ করে (সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের উৎকর্ষ সাধন করে), যাহা বিদ্যারূপ বধূর প্রাণ-স্বরূপ (যাহা দ্বারা তত্ত্ব-জ্ঞান, অথবা ভক্তি, হৃদয়ে স্ফুরিত এবং রক্ষিত হয়), যাহা আনন্দ-সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করে, যাহার প্রতিপদেই পূর্ণামৃতের আস্বাদন— সকল রসেরই আস্বাদন পাওয়া যায়, এবং যাহা সর্ব্বাত্ম-তৃপ্তিজনক—(মন আদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের তৃপ্তি বিধায়ক)—সেই শ্রীকৃষ্ণ নাম-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বোৎকর্ষে বিজয় করিতেছেন। ৩

চেতোদর্পণ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে; এই শ্লোকটী শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর স্বরচিত; ইহাই শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন জীবের (ক) চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জ্জিত করে, (খ) সংসাররূপ মহাদাবানলকে নির্ব্বাপিত করে, (গ) জীবের মঙ্গলরূপ কৌমুদীকে জ্যোৎস্না বিতরণ করে, (ঘ) ইহা বিদ্যাবধূর জীবন সদৃশ, (ঙ) ইহা আনন্দরূপ সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করে (উচ্ছলিত করে), (চ) ইহার-প্রতিপদেই পূর্ণামৃতাস্বাদন হয়, (ছ) ইহা মন-আদি সমস্ত ইন্দ্রিয়-বর্গের তৃপ্তিজনক। সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক এই কয়টী বিষয়-সম্বন্ধে একটু আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

(ক) **চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং**—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনতুল্য। জীবের চিত্তকে দর্পণ (আয়না বা আরসি) বলা হইয়াছে; দর্পণে যদি ধুলা-বালি-আদি ময়লা পড়ে, তাহা হইলে বস্ত্রাদি দ্বারা মাজিয়া তাহা দূর করিয়া দর্পণকে পরিষ্কার করা হয়; এইরূপে পরিষ্কারক বস্ত্রাদিকে বলে মার্জ্জন (যাহাদ্বারা মার্জ্জিত করা হয়)। জীবের চিত্তরূপ দর্পণে ময়লা পড়িয়াছে, সঙ্কীর্ত্তনরূপ বস্ত্রাদি দ্বারা পুনঃ পুনঃ চিত্তকে মার্জ্জিত করিলে চিত্তদর্পণ স্বচ্ছ হইবে—ইহাই "চেতোদর্পণ-মার্জ্জন"-শব্দের মর্ম্ম।

দর্পণের সঙ্গে চিত্তের তুলনা দেওয়ার সার্থকতা কি? দর্পণ যদি পরিষ্কার থাকে, তাহা হইলে তাহার সম্মুখভাগে নিকটে যে বস্তুটী থাকে, দর্পণের মধ্যে সর্ব্বদাই তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে; ঐ বস্তুটী যদি সর্ব্বদাই দর্পণের সম্মুখে ও নিকটে থাকে, তাহা হইলে দর্পণের মধ্যে সর্ব্বদাই তাহার প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে। কিন্তু দর্পণে যদি প্রচুর পরিমাণে ময়লা জমে, তাহা হইলে কোনও বস্তুর প্রতিবিম্বই তাহাতে প্রতিফলিত হইবে না; বস্ত্রাদি দ্বারা ময়লা দূর করিতে থাকিলে, যতই ময়লা দূরীভূত হইবে, ততই সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে, ময়লা যখন সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবে, তখন প্রতিবিম্বও সম্যক্‌রূপে স্পষ্ট হইবে।

দর্পণের সঙ্গে জীবের চিত্ত তুলিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে—দর্পণের ন্যায় চিত্তেরও প্রতিফলন-ক্ষমতা আছে, চিত্তেও নিকটস্থ বস্তু প্রতিফলিত হইতে পারে। কিন্তু চিত্তের নিকটস্থ বস্তু কি? তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণধাম উভয়ই "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু"—এই বিভুত্বাদি নিত্য; সুতরাং সর্ব্বব্যাপক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণধাম সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন; তাই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণধাম সর্ব্বদাই সকলের নিকটতম বস্তু; জীবের চিত্তরূপ দর্পণ যদি নির্ম্মল থাকে, তাহা হইলে সেই চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণধাম—(সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলাদিও) সর্ব্বদাই প্রতিফলিত হইবে—স্ফুরিত হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে, নির্ম্মল চিত্তে সন্নিহিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণধাম যেমন প্রতিফলিত হইতে পারে, তদ্রূপ নিকটবর্ত্তী প্রাকৃত বস্তু-আদিও তো প্রতিফলিত হইতে পারে? তাহা হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণাদি বিভু-বস্তু সর্ব্বত্রই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আছেন—সুতরাং চিত্তের অতি নিকটতম প্রদেশেও আছেন; কোনও প্রাকৃত বস্তুই চিত্তের তত নিকটে যাইতে পারে না,—প্রাকৃতবস্তু এবং চিত্তের মধ্যস্থলে থাকিবেন শ্রীকৃষ্ণাদি বিভুবস্তু; প্রাকৃতবস্তু থাকিবে শ্রীকৃষ্ণাদির পশ্চাদ্‌ভাগে; দর্পণে সম্মুখস্থ বস্তুই প্রতিফলিত হয়, পশ্চাদ্‌বর্ত্তী বস্তু প্রতিফলিত হয় না—সম্মুখে দর্পণ রাখিলে পৃষ্ঠদেশ দর্পণে প্রতিফলিত হয় না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাদি বিভুবস্তুই নির্ম্মল চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হইবে--প্রাকৃতবস্তু প্রতিফলিত হইবে না। আবার শ্রীকৃষ্ণাদি বিভুবস্তু বলিয়া তাঁহাদের প্রতিবিম্বেই সমস্ত দর্পণ জুড়িয়া থাকিবে--অন্য বস্তুর প্রতিবিম্বের স্থানই থাকিবে না। এই গেল নির্ম্মল চিত্তের অবস্থা। কিন্তু চিত্ত যদি নির্ম্মল—স্বচ্ছ—না হয়, তাহা হইলে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণাদি বিভুবস্তু প্রতিফলিত হইবে না।

জীব স্বরূপে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব; তাহার চিত্তও স্বরূপে শুদ্ধ, স্বচ্ছ, নির্ম্মল—কৃষ্ণবিষয়ক বস্তুর প্রতিবিম্ব-গ্রহণের যোগ্য—নির্ম্মল দর্পণের তুল্য। কিন্তু যাহারা মায়াবদ্ধ জীব, অনাদিকাল হইতেই তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া দ্বিতীয় বস্তু মায়াতে অভিনিবিষ্ট হইয়া আছে—মায়িক-উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া আছে; তাই তাহাদের চিত্ত মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া মলিন হইয়া পড়িয়াছে—ভগবদ্‌-বিষয়ক বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণে অযোগ্য হইয়াছে। এই মায়িক-মলিনতা দূরীভূত হইলে চিত্ত আবার স্বরূপে অবস্থিত হইবে—নির্ম্মল-দর্পণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-বস্তু তখনই তাহাতে প্রতিফলিত হইবে। চিত্তের এই মলিনতাকে দূর করিবার উপায় শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন; নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে চিত্তের মায়া-মলিনতা অন্তর্হিত হইবে—যেমন, বস্ত্রাদি দ্বারা পুনঃ পুনঃ মার্জ্জন করিতে করিতে দর্পণের ধূলাবালিরূপ মলিনতা দূরীভূত হয়।

(খ) ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন সংসার-মহাদাবানলকে নির্ব্বাপিত করে। জীবের ত্রিতাপ-জ্বালাই তাহার সংসারজ্বালা; ইহাকেই মহাদাবাগ্নি বলা হইয়াছে। দাবাগ্নি—বনাগ্নি, বনের আগুন; বনে আগুন লাগিলে তাহাতে সমস্ত বন পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়াও জীব অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; তাই ত্রিতাপজ্বালারূপ সংসার-দুঃখকে দাবাগ্নি বলা হইয়াছে। সংসারজ্বালাকে দাবানলের সঙ্গে তুলিত করার সার্থকতা আছে; প্রথমতঃ, বনে যে আগুন লাগে, তাহা সাধারণতঃ বাহির হইতে কেহ ধরাইয়া দেয় না; বনমধ্যস্থ বৃক্ষসমূহের পরস্পর সংঘর্ষণে বনের মধ্যেই ইহার উৎপত্তি। জীবের সংসারজ্বালাও তদ্রূপ; বাহিরের কোনও বস্তুই এই জ্বালার হেতু নহে—দুর্ব্বাসনাসমূহের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে চিত্তের মধ্যেই ইহার জন্ম। দুর্ব্বাসনার প্রেরণায় আমরা যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকি, বা পূর্ব্বজন্মে করিয়া আসিয়াছি, তাহারই ফল আমাদের ত্রিতাপ-জ্বালা। এজন্য আমরা নিজেরাই দায়ী, অপর কেহ দায়ী নহে। অনেক সময় আমরা মনে করি, অমুকের জন্য আমার এই বিপদটী ঘটল; এইরূপ মনে করাও ভ্রান্তি। বিপদ আমাদের কর্ম্মার্জ্জিত ফল, আমাদিগকে তাহা ভোগ করিতেই হইবে; যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ফল আসিয়াছে, সে সেই ফলের বাহকমাত্র। বাজারে ফল কিনিয়া রাখিয়া আমি যদি দোকানীকে বলি—কুলিদ্বারা ফলগুলি পাঠাইয়া দিবে, কুলি যদি সেই ফল নিয়া আসে, আর তাহা যদি বিস্বাদ হয়, তবে তজ্জন্য কুলি দায়ী নয়; দায়ী আমিই। যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমার বিপদ আসে, সেও আমার উপার্জ্জিত কর্ম্মফলই বহন করিয়া আনে; নূতন কিছু আনে না; আমার দুঃখের জন্য তাহাকে দায়ী করিয়া তাহার প্রতি অসদাচরণ করিলে আমার পক্ষে আবার একটী নূতন কর্ম্মই করা হইবে, সেই নূতন কর্ম্মের ফলও আমাকেই ভোগ করিতে হইবে। আমাদের কর্ম্মফল অনুসারেই আমাদের জন্ম হয়; যে স্থানে, যেরূপ মাতাপিতার গৃহে, যেরূপ আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে, যেরূপ আবেষ্টনীর মধ্যে, জন্ম হইলে আমাদের কর্ম্মফল ভোগের সুবিধা হইতে পারে, আমরা সেইরূপ স্থানে এবং সেইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। যাদের মধ্যে জন্মে, তাহারা ও আমরা পরস্পরের কর্ম্মফল ভোগের পক্ষে পরস্পরের সহায়, পরস্পর পরস্পরের কর্ম্মফলের বাহক। দ্বিতীয়তঃ, দাবানল যখন জ্বলিতে থাকে, বন বা বনস্থ বৃক্ষাদি আগুন হইতে দূরে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সরিয়া যাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে না—একস্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল দগ্ধ হইতেই থাকে। মায়াবদ্ধ জীবের অবস্থাও তদ্রূপ—জীব ত্রিতাপ-জ্বালায় কেবল জ্বলিতেই থাকে—মায়িক সুখভোগের আশা-রজ্জুদ্বারা নিজেকে সংসারের সঙ্গে এমনভাবেই বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে, সে ঐ ত্রিতাপজ্বালা হইতে দূরে পলাইয়া যাইয়া (কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া) আত্মরক্ষা করিতে পারে না। "সংসার বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে, জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥ শ্রীলঠাকুর মহাশয়।" তৃতীয়তঃ, দাবানলে দগ্ধ হইয়া বন নিজের অস্তিত্বই যেন হারাইয়া ফেলে—বনের কোনও চিহ্নই আর তখন তাহাতে দেখা যায় না। মায়াবদ্ধ জীবের অবস্থাও তদ্রূপ—জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপগত কর্ত্তব্য; কিন্তু সংসারের আবর্ত্তে পড়িয়া কৃষ্ণসেবার কথাই জীবের চিত্তে উদিত হয় না—তাহার কৃষ্ণদাসত্বের কোনও চিহ্নই থাকে না।

যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে বহু সময় পর্য্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে থাকে, তাহা হইলে দাবানল নির্ব্বাপিত হইতে পারে। তদ্রূপ, নিরবচ্ছিন্নভাবে বহুকাল শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিলে জীবের সংসার-তাপ দূরীভূত হইতে পারে।

সংসারকে মহাদাবানল বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ক্ষুদ্র অগ্নিশিখা বাতাসে নিভিতে পারে; কিন্তু দাবানল বাতাসে নিভিতে পারে না; প্রচুর বৃষ্টিপাতে নিভিতে পারে; কিন্তু মহাদাবানল বোধহয় প্রচুর বৃষ্টিপাতেও সহসা নিভিতে পারে না। জীবের সংসার-দুঃখও লোকের সান্ত্বনাবাক্যে, প্রাকৃত ভোগ্যবস্তুর উপভোগাদিতে বা ঔষধাদিতে দূরীভূত হইতে পারে না—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই ইহাকে দূরীভূত করিতে সমর্থ।

(গ) **শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণং**—শ্রেয়ঃ অর্থ মঙ্গল; কৈরব অর্থ কুমুদ; চন্দ্রিকা অর্থ জ্যোৎস্না। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন জীবের মঙ্গলরূপ কুমুদের পক্ষে জ্যোৎস্না-বিতরণ-তুল্য। জ্যোৎস্নার সংস্পর্শে রাত্রিকালে কুমুদ বিকশিত হয়, ইহাই কবির ধারণা। জ্যোৎস্নার স্পর্শে কুমুদ যেমন বিকশিত হইয়া স্নিগ্ধ হাস্যে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবেও তদ্রূপ মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণ সেবোন্মুখতারূপ মঙ্গল বিকশিত হইতে থাকে। কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে জীবের চিত্ত হইতে দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হইতে থাকে এবং কৃষ্ণ-সেবার বাসনা উন্মেষিত হইতে থাকে।

অনেক সময় আমরা আমাদের সাংসারিক মঙ্গলকেই শ্রেয় (মঙ্গল) মনে করি; বাস্তবিক তাহা মঙ্গল নয়, তাহা আমাদের প্রেয় (ইন্দ্রিয়-সুখের তৃপ্তি সাধক বস্তু) মাত্র। ইহা আমাদের সংসার-বন্ধনকে আরও দৃঢ়তর করিয়া দুঃখেরই পরিপোষণ করে। বিশেষতঃ, এই প্রেয়, যাহাকে আমরা শ্রেয় বলিয়া মনে করি, তাহা—চিরস্থায়ীও নয়। বাস্তব শ্রেয় বা মঙ্গল বলা যায় সেই বস্তুকেই, যাহা ধ্বংসহীন, যাহার পরিণামেও দুঃখ নাই, যাহা পাইলে সুখের জন্য ছুটাছুটিও আত্যন্তিক নিবৃত্তি লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবাই একমাত্র সেই শ্রেয় বা মঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবা লাভের জন্য প্রয়োজন—জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস, এই জ্ঞানের স্ফুরণ, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞানের বিকাশ এবং সেবা-বাসনার বিকাশ। সম্বন্ধ-জ্ঞান ও সেবা-বাসনা বিকাশের জন্য সর্ব্বপ্রথম দরকার কৃষ্ণোন্মুখতা। এই কৃষ্ণোন্মুখতার বিকাশই আমাদের শ্রেয়রূপ কুমুদের বিকাশের প্রথম স্তর। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবেই তাহা হইতে পারে এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবেই পরবর্ত্তী স্তরগুলিও ক্রমশঃ বিকশিত হইতে পারে।

(ঘ) **বিদ্যাবধূজীবনং**—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন জীবের বিদ্যাবধূর জীবন-সদৃশ। যাহা ব্যতীত কেহ বাঁচিতে পারে না, তাহাই তাহার জীবন বা প্রাণ; শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত বিদ্যাবধূ বাঁচিতে পারে না; তাই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনকে বিদ্যাবধূর জীবন বলা হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাবধূ কি? বিদ্যারূপা বধূ—বিদ্যাবধূ; বধূর সঙ্গে বিদ্যার তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যা কি? যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাই বিদ্যা; আবার যে বস্তুটী জানিলে, আর কিছুই জানার বাকী থাকে না, সেই বস্তুটী জানা যায় যদ্দ্বারা, তাহাতেই বিদ্যার পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-তত্ত্ব; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারিলে আর কিছুই জানার বাকী থাকে না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে জানিবার একমাত্র উপায়—ভক্তি (ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ); সুতরাং ভক্তিই হইল শ্রেষ্ঠা বিদ্যা; তাই শ্রীল রামানন্দ রায় বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥ ২।৮।১৯৯॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিদ্যাবধূজীবন-শব্দে কৃষ্ণভক্তিকেই "বিদ্যা" বলা হইয়াছে; এই বিদ্যাকে আবার বধূ বলা হইয়াছে; ইহার তাৎপর্য্য বোধহয় এই যে—কৃষ্ণভক্তি, বধূরই ন্যায়—কোমল-স্বভাবা, স্নিগ্ধা, সেবা-পরায়ণা, মধুর-স্বভাবা ও সদাহাস্যময়ী বা প্রসন্না এবং আত্মগোপন-চেষ্টিতা; অর্থাৎ যাঁহার চিত্তে ভক্তিরাণী কৃপা করিয়া আবির্ভূত হয়েন, তাঁহারও ঐরূপ প্রকৃতিই হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন এই বধূপ্রকৃতি কৃষ্ণভক্তির জীবনতুল্য; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত কৃষ্ণভক্তি উন্মেষিত হইতে পারে না, উন্মেষিত হওয়ার পরেও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত ভক্তি স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। ভক্তির উন্মেষের নিমিত্ত এবং তাহার রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদাই সঙ্কীর্ত্তন প্রয়োজনীয়। ২।১।১৩৩—৩৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—নাম উপায়ও বটে, উপেয়ও বটে; নাম স্বয়ংই পরম-পুরুষার্থ (পূর্ব্ববর্তী ৩।২০।৭ পয়ারের টীকায় ধ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। নাম হইল নামীর ন্যায় পরম আস্বাদ্য, পরম মধুর। আলোচ্য শ্লোকের "বিদ্যাবধূ-জীবনম্"।—অংশ পর্য্যন্ত নাম-সঙ্কীর্ত্তনের উপায়ত্বের কথাই বলা হইয়াছে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত হয় এবং চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়। মায়ামলিনতাই কলাপাতার ন্যায় আমাদের জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ের উপরে অবস্থিত আছে বলিয়া পরমমধুর নামের সঙ্গে জিহ্বাদির স্পর্শ হইতে পারে না। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে সেই মলিনতারূপ কলাপাতার আবরণ দূরীভূত হইলেই জিহ্বাদির সঙ্গে নামের স্পর্শ হইতে পারে, তখনই নাম-মাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে। এই নাম-মাধুর্য্যের আস্বাদন কিরূপ অপূর্ব্ব, তাহাই শ্লোকের শেষার্দ্ধে বলা হইয়াছে। এইরূপে শ্লোকের শেষার্দ্ধ হইল নাম-সঙ্কীর্ত্তনের উপেয়ত্বের বা পরম-পুরুষার্থতার প্রতিপাদক। এক্ষণে শেষার্দ্ধের শব্দগুলিই আলোচিত হইতেছে।

(ঙ) **আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং**—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন আনন্দ-সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রবক্ষে যেমন বিচিত্র তরঙ্গমালার উদয় হয়, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবেও তদ্রূপ ভক্তের হৃদয়ে আনন্দ নানা বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে ভক্তের হৃদয় সর্ব্বদাই আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে নদী যেমন কানায় কানায় জলপূর্ণ থাকে, শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের প্রভাবে ভক্তের হৃদয়ও তদ্রূপ আনন্দ-লহরীতে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে।

(চ) **প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং**—শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের প্রত্যেক পদেই পূর্ণামৃতের (সকল রসের) আস্বাদন পাওয়া যায়; সঙ্কীর্ত্তন-কালে যতগুলি পদ (বা শব্দ) কীর্ত্তিত হয়, তাহাদের প্রত্যেক পদেই সকল রসের পূর্ণ-আস্বাদন পাওয়া যায়; ইহার কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনও আনন্দ-স্বরূপ। "কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥ ২।১৬।১০। তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ। নাম-সঙ্কীর্ত্তন সব আনন্দ-স্বরূপ॥ ১।১।৫৪॥"

নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামীর ন্যায় নামও পূর্ণ। "পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনঃ॥" পূর্ণ শব্দে সেই বস্তুকেই বুঝায়, যাহা হইতে সম্পূর্ণ বস্তুটী লইয়া গেলেও সম্পূর্ণ বস্তুটীই অবশিষ্ট থাকে। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥" পূর্ণ হইল অসীম, সর্ব্বব্যাপক; তাহার কোনও অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া সম্ভব নয়। তথাপি যাহাকে তাহার অংশ বলিয়া মনে করা যায়, তাহাতেও পূর্ণবস্তুর ধর্ম্ম পূর্ণরূপে বিরাজিত; তাহার মাধুর্য্যাদি পূর্ণতমরূপেই তাহার অংশবৎ প্রতীয়মান বস্তুতেও বিদ্যমান থাকে; ইহাই পূর্ণবস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্ম। এইরূপ পূর্ণ-বস্তু আছে মাত্র একটী—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার অভিন্নস্বরূপ শ্রীনাম। তাই সম্পূর্ণ নামের আস্বাদনে যে পূর্ণ মাধুর্য্যের অনুভব হয়, নামের এক অংশে, নামের একটি পদে, এমন কি একটী অক্ষরেও—সেই পূর্ণ মাধুর্য্যের পূর্ণ আস্বাদন পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু "জগন্নাথ" বলিতে যাইয়া প্রেমাবেশ-বশতঃ পূর্ণ নামটী উচ্চারণ করিতে পারেন নাই, কেবল "জ-জ গ-গ" মাত্র বলিয়াছিলেন; এই একটী বা দুইটী অক্ষরের আস্বাদনেই তিনি "জগন্নাথ"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই সম্পূর্ণ নামটীর পূর্ণতম মাধুর্য্যের আস্বাদন পাইয়াছিলেন। "প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্"-বাক্যে এইরূপ তাৎপর্য্যই প্রকাশ করা হইয়াছে।

নামের মাধুর্য্য এমনই চিত্তহারী যে, একবার উচ্চারণ করিলে জিহ্বা যেন তাহা আর ছাড়িতে পারে না। তাই স্বয়ং শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। ঐ নাম কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ॥ না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সখি তারে॥" এই নাম স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য বলবতী লালসা জাগাইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই ব্যাকুল করিয়া তোলে। তাই যখন এই পরম মধুর নাম জিহ্বায় আবির্ভূত হয়, তখন অসংখ্য জিহ্বা পাওয়ার জন্য লালসা জাগায়, যখন কর্ণে আবির্ভূত হয়, তখন অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কর্ণ পাওয়ার ইচ্ছাকে বলবতী করে এবং যখন এই নাম হৃদয়-চত্বরে নৃত্য করিতে থাকে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই স্তম্ভিত হইয়া যায়। একথাই শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী নান্দীমুখীর নিকটে বলিয়াছেন—"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে। কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্॥ চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিম্। নো জানে কিয়দ্ভিরমৃতৈ রচিতা কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥ (৩।১।১—শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য)।

(ছ) **সর্ব্বাত্ম-স্নপনং**—সর্ব্ব (সকল) আত্মার (দেহের, মনের—দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের) পক্ষে স্নপন (যাহাদ্বারা স্নান করা যায়, তাহার) তুল্য। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে প্রখর সূর্য্যকিরণের মধ্যে নগ্নপদে অনাবৃত-দেহ-মস্তকে যদি কেহ বিস্তীর্ণ রৌদ্রদগ্ধ ময়দানের উপর দিয়া অনেক সময় পর্য্যন্ত পদব্রজে চলিয়া আসে, তখন তাহার দেহের ভিতর বাহির যেন জ্বলিয়া যাইতে থাকে। তখন যদি সে ব্যক্তি শীতল জলে ডুব দিয়া স্নান করে এবং শীতল পানীয় পান করে, তাহা হইলেও তাহার জ্বালা সম্যক্ দূরীভূত হয় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের পরম-স্নিগ্ধ এবং অমৃত-নিন্দি সুমধুর-রস—অনাদিকাল হইতে সংসার-মরুভূমিতে ভ্রমণশীল ত্রিতাপ-জ্বালা-দগ্ধ জীবের দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, দেহের অতি সূক্ষ্মতম অংশকেও পরিনিষিক্ত করিয়া তাহার পরম-স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন কৃপা করিয়া যখন বাগিন্দ্রিয় জিহ্বায় আত্মপ্রকট করে, তখন জিহ্বা আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়। ঐ সঙ্কীর্ত্তন আবার চিত্তে বিহার করিয়া চিত্তকেও আনন্দ-রসে সংপ্লাবিত করে—চিত্তে তখন আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে থাকে; এই তরঙ্গ চিত্ত হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ে ও সমস্ত দেহে সংক্রামিত হইয়া সমস্ত দেহেন্দ্রিয়কে আনন্দরসে অভিষিক্ত করিয়া থাকে। কেবল চিত্ত কেন, নামরূপ অমৃত যে কোনও একটী ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হইলেই স্বীয় মধুর রস-ধারায় সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সম্যক্‌রূপে প্লাবিত করিয়া দেয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়ে এবং দেহের প্রতি রন্ধ্রে, প্রতি অণুতে পরমাণুতে প্রবেশ করিয়া সমস্তকে সম্যক্‌রূপে পরিনিষিক্ত ও পরিসিঞ্চিত করিয়া দেয়। "একস্মিন্নিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ। আপ্লাবয়তি সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈর্নিজৈঃ॥ বৃ, ভা, ২।৩।১৬২॥" এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন হইল সর্ব্বাত্ম-তৃপ্তিজনক।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় সংকীর্ত্তন; শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির সংকীর্ত্তন। পূর্ব্ব-পয়ারসমূহে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের কথা উল্লিখিত থাকায়, এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধেই এই "চেতোদর্পণ"-শ্লোকটী উল্লিখিত হওয়ায়, এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন শব্দে শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তনই বোধ হয় লক্ষিত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের টীকায়ও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি নামোচ্চারণ।

এই শ্লোকে জগতের জীবের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী আশীর্ব্বাদও যেন প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজিত আছে বলিয়া মনে হয়। "শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং বিজয়তে—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হইতেছে।" সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য যদি জগতে সর্ব্বতোভাবে প্রচারিত হয়—জগতের সকল লোক যদি সঙ্কীর্ত্তন করে, সঙ্কীর্ত্তনের ফলে যদি তাহাদের চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয়, যদি তাহাদের বিশুদ্ধ চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাদের চিত্তে যদি আনন্দ-সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, যদি নামের প্রতি পদে, প্রতি অক্ষরে তাহারা পূর্ণ আনন্দের আস্বাদন পাইতে পারে, যদি

সঙ্কীর্ত্তন-হৈতে—পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম ॥ ১০
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন ॥ ১১
উঠিল বিষাদ দৈন্য পঢ়ে আপন শ্লোক।
যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ-শোক ॥ ১২

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহাদের দেহ, মন, ইন্দ্রিয়—দেহের প্রতি অণু পরমাণু নামামৃতরসে সম্যক্‌রূপে পরিসিঞ্চিত হয়—তাহা হইলেই বলা যায়, নাম-সঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হইতেছে। তাহা হইলেই জগতের জীব নাম-সঙ্কীর্ত্তনের জয়কীর্ত্তনে মুখর হইতে পারে। তাহাই যেন হয়—ইহাই যেন জগতের জীবের প্রতি প্রভুর প্রচ্ছন্ন আশীর্ব্বাদ।

১০। এইক্ষণে "চেতোদর্পণ"-শ্লোকের মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন।

সঙ্কীর্ত্তন-হৈতে—শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে।

পাপ-সংসার-নাশন—পাপনাশন এবং সংসার নাশন। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে সর্ব্ববিধ পাপ দূরীভূত হয় এবং সংসারবন্ধন, ত্রিতাপ-জ্বালাদি-সংসার-দুঃখ দূরীভূত হয়।

পাপ-সংসার-নাশন-শব্দে "ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণের" মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে।

চিত্ত-শুদ্ধি—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে চিত্তের-মায়ামলিনতা দূরীভূত হয়, চিত্তের দুর্ব্বাসনাদি অন্তর্হিত হয়। ইহা "চেতোদর্পণ-মার্জ্জন"-শব্দের তাৎপর্য্য।

সর্ব্ব-ভক্তি-সাধন-উদ্গম—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে সমস্ত ভক্তি-সাধনের-উদয় হয়; ভক্তিমার্গে যে যে সাধনের অনুষ্ঠান প্রয়োজন, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে সে সমস্তই চিত্তে স্ফুরিত হয়, এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সাধকের দ্বারা সে সমস্ত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করাইয়া লয়। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে চিত্তের মলিনতা যখন দূরীভূত হইতে থাকে, তখন চিত্ত ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ হয় এবং স্বতঃই নববিধা-ভক্তির এবং লীলাস্মরণাদির অনুষ্ঠান করিতে সাধকের প্রবৃত্তি জন্মে—সাধক অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সহিত সে সমস্তের অনুষ্ঠানও করিয়া থাকেন।

অথবা, সর্ব্ব-ভক্তি-সাধন-উদ্গম—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে সর্ব্ববিধ-সাধন-ভক্তির ফলের উদয় হয়, বিভিন্ন সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে যে ফল পাওয়া যায়, এক নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবেই সেই ফল (প্রেম বা কৃষ্ণ-সেবায় প্রবৃত্তি) পাওয়া যায়। "নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে। ২।১৫।১০৮॥" ইহা "শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং" শব্দের তাৎপর্য্য। ইহাতে "বিদ্যাবধূজীবনং" শব্দের মর্ম্মও ব্যক্ত হইতেছে।

১১। **কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম**—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ফলে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং" শব্দের তাৎপর্য্য।

প্রেমামৃতাস্বাদন—নাম-সঙ্কীর্ত্তনে প্রেমরূপ অমৃতের মাধুর্য্য আস্বাদিত হয়। "পূর্ণামৃতাস্বাদনং" শব্দের তাৎপর্য্য।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয়।

সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন—শ্রীকৃষ্ণসেবায় কীর্ত্তনকারী আনন্দরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হয়েন। "সর্ব্বাত্মস্নপনং" শব্দের মর্ম্ম।

১২। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা বর্ণন করিতে করিতে ভক্তভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে হইল, নামে তাঁহার অনুরাগ নাই, তাই তিনি নামের ফল হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ইহা মনে হইতেই প্রভুর মনে দৈন্য ও বিষাদের উদয় হইল; দৈন্য ও বিষাদে অভিভূত হইয়া প্রভু "নাম্নামকারি" ইত্যাদি নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন; এই শ্লোকটীও প্রভুর স্বরচিত—ইহা শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোক।

আপন শ্লোক—স্বরচিত "নাম্নামকারি" শ্লোক। **যার অর্থ**—যে শ্লোকের অর্থ।

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৩১)—
নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ৪॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥ ১৩

খাইতে-শুইতে যথা-তথা নাম লয়।
দেশ-কাল-নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অকারি ভগবতা স্বয়া কর্ত্তৃভূতেনেতি শেষঃ। ইহ নাম্নি। চক্রবর্ত্তী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৪। অন্বয়। নাম্নাং (ভগবন্নাম-সমূহের) বহুধা (মুকুন্দ, গোবিন্দ, হরি, পূতনারি ইত্যাদি বহু প্রকারে) অকারি (প্রচার করিয়াছেন); তত্র (তাহাতে—সেই নামে) নিজসর্ব্বশক্তিঃ (নিজের সমস্ত শক্তি) অর্পিতা (অর্পিত হইয়াছে); স্মরণে (সেই নামের স্মরণ-বিষয়েও) কালঃ (সময়—সময়সম্বন্ধীয় কোনওরূপ) ন নিয়মিতঃ (নিয়মও করেন নাই); ভগবন্ (হে ভগবন্)! তব (তোমার) এতাদৃশী (এরূপই) কৃপা (কৃপা); মম অপি (আমারও) ঈদৃশং (এইরূপ) দুর্দ্দৈবং (দুর্দ্দৈব যে), ইহ (এই নামে) অনুরাগঃ (অনুরাগ) ন অজনি (জন্মিল না)।

অনুবাদ। ভগবান্ (মুকুন্দ, গোবিন্দ, হরি, পূতনারি ইত্যাদি) বহু প্রকারে নিজ নাম প্রচার করিয়াছেন; সেই নামে আবার নিজের সমস্ত শক্তিও অর্পণ করিয়াছেন; সেই নামের স্মরণ-বিষয়ে সময়সম্বন্ধীয় কোনও নিয়মও নাই; হে ভগবন্! এইরূপই তোমার কৃপা। কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে, এমন নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না। ৪

পরবর্ত্তী চারি পয়ারে এই শ্লোকের অর্থ বিবৃত হইয়াছে।

১৩। এক্ষণে চারি পয়ারে "নাম্নামকারি" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

অনেক লোকের ইত্যাদি—ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি; তাই তাহাদের ইচ্ছাও ভিন্ন ভিন্ন—অনেক প্রকার। **কৃপাতে**—জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ। **করিল অনেক নামের প্রচার**—শ্রীকৃষ্ণ নিজের অনেক নাম—মুকুন্দ, গোবিন্দ, হরি, পূতনারি ইত্যাদি অনেক নাম—প্রচার করিলেন।

জগতে সকল লোকের রুচি বা বাসনা সমান নহে; এক এক জন এক এক বিষয় কামনা করেন; ভগবানের একই নামে সকলের রুচিও হয় না—এক এক জন এক এক নামে প্রীতি পায়েন। তাই তাঁহাদের প্রতি কৃপা করিয়া পরমদয়াল শ্রীকৃষ্ণ নিজের অনেক রকম নাম প্রকট করিয়াছেন—যেন যাঁহার যে নাম ইচ্ছা, গ্রহণ করিতে পারেন। যিনি মুক্তি কামনা করেন, তিনি হয়ত মুকুন্দ নাম কীর্ত্তন করিতে ভালবাসেন; যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবার ইচ্ছা করেন, তিনি হয়ত গোবিন্দ নামেই সমধিক আনন্দ পায়েন; যিনি বিঘ্নাদি হইতে উদ্ধার কামনা করেন, তিনি হয়ত পূতনারি নামেই উল্লাস পায়েন; ইত্যাদি কারণে প্রত্যেকেই স্বস্ব-অভিরুচি অনুসারে যেন ভগবানের নামকীর্ত্তন করিতে পারেন, তাই ভগবান্ মুকুন্দ-গোবিন্দ-আদি নিজের বহু নাম প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীভগবানের সকল নামেরই সমান শক্তি, সমান মহিমা। তথাপি যাঁহার যে নামে অভিরুচি, যাঁহার যে নামে প্রীতি, সেই নামের কীর্ত্তনেই তাঁহার অধিক আনন্দ; সুতরাং সেই নামের কীর্ত্তনই তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক। শ্রীমদ্ভাগবতের "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ"-ইত্যাদি বাক্যেও "স্বপ্রিয়নাম—নিজের প্রিয় যে নাম, সেই নাম"-কীর্ত্তনের কথা জানা যায়। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও তাহাই বলেন। "সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ। যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ॥ ১১।১৩৪॥" বৃহদ্ভাগবতামৃতও তাহাই বলেন। "সর্ব্বেষাং ভগবন্নাম্নাং সমানো মহিমাপি চেৎ। তথাপি স্বপ্রিয়েণাশু স্বার্থসিদ্ধিঃ সুখং ভবেৎ॥ ২।৩।১৬০॥"

এই পয়ারে শ্লোকস্থ "নাম্নামকারি বহুধা" অংশের অর্থ করা হইয়াছে।

১৪। ভগবান্ এমনি দয়ালু যে, যেন যে কোনও লোক, যে কোনও সময়ে যে কোনও অবস্থাতেই স্বীয় অভীষ্ট

সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ। | আমার দুর্দ্দৈব, নামে নাহি অনুরাগ ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাম কীর্ত্তন করিতে পারেন, তাই তিনি নাম-গ্রহণের নিমিত্ত কোনও নিয়মের অপেক্ষাই রাখেন নাই—খাইতে বসিয়া, শুইতে যাইয়া, কি শুইয়া শুইয়া, পবিত্র স্থানে হউক, কি অপবিত্র স্থানেই হউক—যে কোনও স্থানেই হউক না কেন, কিম্বা যে কোনও সময়েই হউক না কেন—শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন করিলেই সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে—পরমকরুণ ভগবান্ এরূপ নিয়মই করিয়াছেন।

খাইতে শুইতে—খাওয়ার সময়ে, কি শোওয়ার সময়ে, বা অন্য কোনও কাজ করার সময়েও নাম করা যায়। স্বপন্ ভুঞ্জন্ ব্রজংস্তিষ্ঠন্নুত্তিষ্ঠংশ্চ বদংস্তথা। যে বদন্তি হরের্নাম তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।২০॥—খাইতে, শুইতে, চলিতে, বসিতে, উঠিতে, কথা বলিতেও যাঁহারা হরিনাম বলেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার নমস্কার।" **যথা-তথা**—যেখানে সেখানে; নাম-গ্রহণে স্থানের পবিত্রতার কোনও অপেক্ষাই নাই। **কাল-দেশ-নিয়ম নাহি**—নাম-গ্রহণসম্বন্ধে দেশকালের বিচার নাই; যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়েই নাম গ্রহণ করা যায়। উচ্ছিষ্ট মুখে, কি উচ্ছিষ্টময় স্থানেও নাম করা যায়। "ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরের্নামনি লুব্ধক॥ হ, ভ, বি, ১১।২০২ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন।" আরও "ন দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে। কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্॥ হ, ভ, বি, ১১।২০৪॥—নাম স্বতন্ত্র (কোনও বিধি-নিষেধের অধীন নহেন); দেশ, কাল, অবস্থা ও শুদ্ধি-আদির অপেক্ষা রাখেন না, নাম সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদ।" **সর্ব্বসিদ্ধি হয়**—সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয়।

এই পয়ারে শ্লোকস্থ "নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ" অংশের অর্থ করা হইয়াছে।

১৫। **সর্ব্বশক্তি**—ভগবানের নিজের সমস্ত শক্তি। ভগবান্ নিজের বহু প্রকার নাম প্রকট করিয়া সেই সকল নামে নিজের সমস্ত শক্তিই অর্পণ করিয়াছেন; প্রত্যেক নামকেই ভগবানের ন্যায় সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থগমন, রাজসূয়যজ্ঞ, অশ্বমেধযজ্ঞ ইত্যাদি সমস্ত অনুষ্ঠানের শক্তিই শ্রীভগবান্ স্বীয় নামের শক্তির অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। "দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ। শক্তয়ো দেব-মহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ। রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তনঃ। আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু॥ —হ, ভ, বি, ১১।১৯৬ ধৃত স্কন্দপুরাণবচন।"

ইহা "নিজ-সর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা" অংশের অর্থ। শ্লোকস্থ "এতাদৃশী তব কৃপা" ইত্যাদি শেষ দুই চরণের অর্থ করিতেছেন—"আমার দুর্দ্দৈব" ইত্যাদি বাক্য।

আমার দুর্দ্দৈব ইত্যাদি—প্রভু দৈন্য করিয়া বলিতেছেন—"ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় ও রুচি জানিয়া প্রত্যেকেরই রুচি ও অভিপ্রায় অনুরূপ স্বীয় বহুবিধ নাম পরমকরুণ ভগবান্ প্রকটিত করিয়াছেন; এই সমস্ত নামে আবার নিজের সমস্ত শক্তিও তিনি অর্পণ করিয়াছেন—তাঁহার যে কোনও নামই তাঁহারই ন্যায় অনন্ত-অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন; আবার এ সমস্ত নামগ্রহণের নিমিত্ত দেশ-কালাদির কোনওরূপ অপেক্ষাও তিনি রাখেন নাই—যে কোনও লোক, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে তাঁহার যে কোনও নাম গ্রহণ করিলেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। ইহা অপেক্ষা জীবের প্রতি ভগবানের করুণার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর কি থাকিতে পারে? কিন্তু ভগবানের এত কৃপা সত্ত্বেও—এত সুযোগ তিনি করিয়া দিলেও, আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, ভগবানের নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না—আমি নাম করিতে পারিলাম না—নামের ফল হইতেও বঞ্চিত হইলাম।"

নামে অনুরাগ—নামে প্রীতি; নামকীর্ত্তনের জন্য উৎকণ্ঠা।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণরতি গাঢ়ত্ব লাভ করিতে করিতে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাবাদি স্তর অতিক্রম করিয়া যায়। এই প্রেম-স্নেহাদি হইল কৃষ্ণরতির স্থায়ী ভাব। সাধক-দেহে জীবের প্রেম পর্য্যন্ত হইতে পারে, তাহার অধিক হয় না। সুতরাং স্থায়ীভাব অনুরাগের কথা তো দূরে, স্নেহ-মানাদিও সাধক-দেহে দুর্লভ। তাই, **সাধক-দেহে অনুরাগ**—বলিতে ভজন-বিষয়ে উৎকণ্ঠাকেই বুঝায়, স্থায়ীভাব অনুরাগকে বুঝায় না। উজ্জলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণে "তদ্ভাববদ্ধরাগা যে জনাস্তে সাধনে রতাঃ। তদ্‌যোগ্যমনুরাগৌঘং প্রাপ্যোৎকণ্ঠানুসারতঃ॥ ৩১॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও তাহাই বলিয়াছেন—"অনুরাগৌঘং রাগানুগীয়-ভজনৌৎকট্যং, ন তু অনুরাগ-স্থায়িনং সাধকদেহে অনুরাগোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ॥—সাধকদেহে স্থায়ীভাব অনুরাগের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া এই শ্লোকে অনুরাগৌঘ-শব্দে রাগানুগীয়-ভজন-বিষয়ে উৎকটতাই সূচিত হইতেছে।"

সকল নামের সমান মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আলোচনা।

"নাম্নামকারি"-ইত্যাদি শ্লোক, ৩।২০।১৩ এবং ৩।২০।১৫ পয়ার হইতে জানা যায়—ভগবানের অনেক নাম এবং সকল নামেই ভগবান্ তাঁহার সমস্ত শক্তি দান করিয়াছেন। সুতরাং সকল নামেরই সমান শক্তি, সমান মাহাত্ম্য—ইহাই বুঝা যায়। আবার কোনও কোনও শাস্ত্র-প্রমাণে কোনও কোনও নামের বৈশিষ্ট্যের কথাও দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে বৃহদ্‌বিষ্ণুসহস্র-নামস্তোত্র হইতে জানা যায়—এক রাম-নাম সহস্র নামের তুল্য। "রাম-রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥ ৭২।৩৩৫॥ (২।৭।৫ শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে জানা গেল—ভগবানের অন্যান্য সহস্র নাম কীর্ত্তনের যে মাহাত্ম্য, একবার রামনাম কীর্ত্তনেরই সেই মাহাত্ম্য। আবার, লঘুভাগবতামৃত (৫।৩৫৪)-ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বচন হইতে জানা যায়, তিনবার সহস্র-নাম-কীর্ত্তনের (অর্থাৎ তিন বার রাম-নাম কীর্ত্তনের) যে মাহাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণ-নামের একবার কীর্ত্তনেরই সেই মাহাত্ম্য। "সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্। একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥ (২।৭।৬ শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য)।" আবার, অন্য প্রমাণে জানা যায়—রাম নামে কেবল মুক্তি পাওয়া যায়, কৃষ্ণনামে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায়, (১।৩।২৪৪ পয়ারের টীকায় শাস্ত্র-প্রমাণ দ্রষ্টব্য)। এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা যায়, সকল ভগবন্নামের সমান মহিমা নয়। ইহার সমাধান কি? শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী ইহার নিম্নলিখিতরূপ সমাধান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—"শ্রীমন্নাম্নাঞ্চ সর্ব্বেষাং মাহাত্ম্যেষু সমেষ্বপি। শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাবতারেষু বিশেষঃ কোঽপি কস্যচিৎ॥ ১১।২৫৭॥—সমস্ত ভগবন্নামের সমান মহিমা হইলেও ভগবৎস্বরূপ-সমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কোনও কোনও নামের কোনও কোনও বিশেষত্ব আছে।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সামান্যতো নাম্নাং সর্ব্বেষামপি মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতো লিখন্ তত্র মাহাত্ম্যস্য সাম্যেঽপি কিঞ্চিৎ বিশেষং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি। শ্রীমদিতি শ্রীমতো ভগবতঃ শ্রীমতাং বা অশেষশোভাসম্পত্ত্যতিশয়যুক্তানাং নাম্নাং কস্যচিৎ নাম্নঃ কোঽপি মাহাত্ম্যবিশেষোঽস্তি। নন্ু চিন্তামণেরিব ভগবন্নাম্নাং মহিমা সর্ব্বেঽপি সম এব উচিত ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন সাম্যেঽপি কিঞ্চিদ্ বিশেষং দর্শয়তি কৃষ্ণস্যৈবেতি। যথা শ্রীনৃসিংহরঘুনাথাদীনাং মহাবতারাণাং সর্ব্বেষাং ভগবত্ত্বয়া সাম্যেঽপি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ংমিত্যুক্ত্যা কৃষ্ণস্যাবতারত্বেঽপি সাক্ষাদ্‌ভগবত্ত্বেন কশ্চিদ্ বিশেষো দর্শিতস্তদ্বদিতি। এতচ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈ র্ব্যাখ্যাতম্। **। পূর্ব্বং বহুবিধ-কামাপহৃতচিত্তান্ প্রতি তত্তৎকামসিদ্ধ্যর্থং তত্তন্নামবিশেষ-মাহাত্ম্যং লিখিতম্, অত্র চ সর্ব্বফলসিদ্ধয়ে নামবিশেষ মাহাত্ম্যমিতি ভেদো দ্রষ্টব্যঃ।" এই টীকার সারমর্ম্ম এই রূপ:—রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ (অবতার) আছেন; তাঁহারা সকলেই ভগবান্, সুতরাং ভগবান্-হিসাবে শ্রীরামনৃসিংহাদি এবং শ্রীকৃষ্ণ ইঁহারা সকলেই সমান। কিন্তু সকলে ভগবান্ হিসাবে সমান হইলেও, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"- এই প্রমাণ অনুসারে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের একটা বিশেষত্ব আছে—তিনি স্বয়ং ভগবান্, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব; অপর ভগবৎ-স্বরূপ সমূহের মধ্যে কেহই স্বয়ংভগবান্ নহেন। তদ্রূপ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীরাম-নৃসিংহাদির নাম এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম—ভগবানের নাম হিসাবে এই সকল নামই সমান; এই সকল ভগবন্নামের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-নামের বিশেষত্ব আছে—শ্রীকৃষ্ণের নাম হইল স্বয়ংভগবানের নাম; রাম-নৃসিংহাদি নাম ভগবন্নাম বটে, কিন্তু স্বয়ংভগবানের নাম নহে; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের নামের বিশেষত্ব।

অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ হইলেন অখিল-রসামৃত-বারিধি শ্রীকৃষ্ণেরই অনন্ত-রস-বৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ; তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের মধ্যে অবস্থিত। "একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি। শ্রুতি। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ। বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্॥" তাঁহারা সকলেই নিত্য এবং স্বরূপে পূর্ণ। "সর্ব্বে পূর্ণাঃ শাশ্বতাশ্চ॥" শক্তি-বিকাশের পার্থক্যানুসারেই তাঁহাদের পার্থক্য। শ্রীরামচন্দ্রে শক্তিসমূহের এক রকম বিকাশ, শ্রীনৃসিংহদেবে আর এক রকম বিকাশ; শ্রীনারায়ণে আর এক রকম বিকাশ; ইত্যাদি। কিন্তু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বশক্তিরই সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। অন্যান্য স্বরূপে শক্তিসমূহের আংশিক বিকাশ; তাই অন্যান্য স্বরূপকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলা হয়।

নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া রাম-নাম এবং রাম-স্বরূপও অভিন্ন। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্র-স্বরূপের যেই মহিমা, তাঁহার রাম-নামেরও সেই মহিমা। এইরূপে যে কোনও ভগবৎ-স্বরূপের যেই মহিমা, তাঁহার নামেরও সেই মহিমা। স্বয়ংভগবান্ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেই সর্ব্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তাঁহার নামেও সর্ব্বনাম মহিমার পূর্ণতম বিকাশ; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া তাঁহার নামও স্বয়ংনাম। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যেমন অপর সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত, সুতরাং এক শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেই যেমন অপর সকলের পূজা হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের নামের মধ্যেও অপর সকল ভগবৎ-স্বরূপের নাম অবস্থিত, শ্রীকৃষ্ণের নামের উচ্চারণেই অপর সকল ভগবৎ-স্বরূপের নামোচ্চারণ হইয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণেই অপর সকল ভগবৎ-স্বরূপের নামোচ্চারণের ফল পাওয়া যায়। একথাই শ্রীপাদসনাতন গোস্বামীর পূর্ব্বোদ্ধৃত টীকার শেষাংশে বলা হইয়াছে। "পূর্ব্বং বহুবিধ-কামাপহতচিত্তান্ প্রতি তত্তৎকামসিদ্ধ্যর্থং তত্তন্নামবিশেষ-মাহাত্ম্যং লিখিতম্, অত্র চ সর্ব্বফলসিদ্ধয়ে নামবিশেষমাহাত্ম্যমিতি ভেদঃ।—সকাম ব্যক্তিদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন কামনা; এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন নামের মাহাত্ম্যের কথা (কোন্ নামের কীর্ত্তনে কোন্ কামনা সিদ্ধ হইবে, তাহা) লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বফল-সিদ্ধির নিমিত্ত নামবিশেষের (শ্রীকৃষ্ণনামের) মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের নামের ফল দিতে সমর্থ; অপর ভগবৎ-স্বরূপের নাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণনামের ইহাই ভেদ।" সকল নামের সমান মাহাত্ম্য সত্ত্বেও ইহাই শ্রীকৃষ্ণনামের বিশেষত্ব।

"সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥" এই প্রমাণ বলে ভগবানের অনন্ত স্বরূপ থাকাসত্ত্বেও যেমন শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও স্বরূপ প্রেম দান করিতে পারেন না—ভগবত্ত্বাহিসাবে সকল ভগবৎ-স্বরূপ সমান হইলেও ইহা যেমন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের একটী বৈশিষ্ট্য—তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নাম অভিন্ন বলিয়া ইহাই সূচিত হইতেছে যে, অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের অনন্ত নাম থাকিলেও এবং সেই সমস্ত নামের মাহাত্ম্য সমান হইলেও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামই প্রেম দিতে পারেন, ইহাও শ্রীকৃষ্ণনামের একটী বৈশিষ্ট্য। ৩।৩।২৪৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

একটী উদাহরণের সাহায্যে সমানের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বস্তুটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। কোনও কলেজে কয়েকজন অধ্যাপক আছেন, একজন অধ্যক্ষও আছেন; অধ্যক্ষও একজন অধ্যাপক। অধ্যাপক-হিসাবে তাঁহারা সকলেই সমান; এই সমানের মধ্যে অবশ্য অধ্যাপকদের পরস্পরের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে—এক একজন এক এক বিষয়ের অধ্যাপক; সকলে একই বিষয়ের অধ্যাপক নহেন। আবার সকলের মধ্যে অধ্যক্ষের একটী বিশেষত্ব আছে—তিনি অধ্যাপক তো বটেনই, আবার অধ্যক্ষও। অধ্যক্ষ হিসাবে কলেজের পরিচালনে এবং অধ্যাপকদের পরিচালনেও তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে। তাঁহার এই বিশেষত্ব হইল সমানের মধ্যে বিশেষত্ব। তদ্রূপ, সকল

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়! ॥ ১৬

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৩২)—
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৫

উত্তম হঞা আপনাকে মানে 'তৃণাধম'।
দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভগবন্নামের সমান মাহাত্ম্য সত্ত্বেও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাই শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের এবং শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর সমাধান।

"নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়"—এই বাক্যে সাধন-ভজনের সর্ব্ববিধ ফলের মধ্যে "পরম ফল—প্রেম" লাভের উপায় সম্বন্ধেই প্রভু বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; যেহেতু, তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন—প্রেমদানের জন্য এবং প্রেমদানের উপায় জানাইবার জন্য। "চেতোদর্পণ"-শ্লোকের "বিদ্যাবধূজীবনম্" "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম্" এবং "প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্" ইত্যাদি শব্দেও প্রেমই সূচিত হইতেছে। পরবর্ত্তী "তৃণাদপি সুনীচেন", "ন ধনং ন জনম্", "অয়ি নন্দতনুজ", "নয়নং গলদশ্রুধারয়া"-ইত্যাদি শ্লোক হইতেও প্রেমই যে প্রভুর লক্ষ্য, তাহা জানা যায়। কিন্তু প্রেম দিতে পারেন—একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ এবং তাঁহার নাম। সুতরাং প্রভু যে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই নামের সঙ্কীর্ত্তন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। ৩।২০।১৩-পয়ারে "কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার।"-বাক্যে এবং "নাম্নামকারি"-ইত্যাদি শ্লোকে যে অনেক নামের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অনেক নাম এবং ৩।২০।১৫ পয়ারে যে "সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ।"-বাক্যেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্ত্বা-সূচক অনেক নামের মধ্যেই "শ্রীকৃষ্ণ"-নামের সমস্ত শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, ইহাই যেন প্রভুর অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত "সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাম্"-ইত্যাদি শ্লোকের অন্তর্গত "কৃষ্ণস্য নামৈকম্"-অংশের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণস্য কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নামৈকমপি—শ্রীকৃষ্ণাবতার সম্বন্ধি একটী নামও।" ইহাতে বুঝা যায়, পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের নামের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই বৈশিষ্ট্য (প্রেম-দাতৃত্বাদি) কেবল যে "শ্রীকৃষ্ণ"-এই নামটীরই আছে, তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণের অবতার-সম্বন্ধি প্রত্যেক নামেরই আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন নানা লীলার ব্যপদেশে তাঁহার যে নানা নাম প্রকটিত হইয়াছিল, সে-সমস্তই হইতেছে—কৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধি নাম; যেমন—কৃষ্ণ, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব, গিরিধারী, নন্দ-নন্দন, যশোদা-নন্দন ইত্যাদি। এই সমস্ত নামের প্রত্যেকটীই শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন, প্রত্যেকটীতেই শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ-নামের সমস্ত শক্তি, সমস্ত মাধুর্য্যাদি, প্রেম-দায়কত্বাদি—সঞ্চারিত আছে। এ-সমস্ত নামের যে কোনও একটীর কীর্ত্তনেই সর্ব্বসিদ্ধিলাভ, এমন কি কৃষ্ণ-প্রেম এবং কৃষ্ণসেবা পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হইতে পারে।

১৬। নাম-গ্রহণ-সম্বন্ধে দেশ-কালাদির অপেক্ষা না থাকিলেও এবং হেলায়-শ্রদ্ধায় নাম-গ্রহণেও নামের ফল মোক্ষাদি পাওয়া গেলেও, নামের মুখ্যফল প্রেম পাইতে হইলে নাম-গ্রহণ-কালে চিত্তের একটী অবস্থার প্রয়োজন; চিত্তের এই অবস্থাটীর কথা—কি ভাবে নাম গ্রহণ করিলে কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যাইতে পারে তাহা—পরবর্ত্তী "তৃণাদপি" শ্লোকে বলিতেছেন। এই শ্লোকটীও প্রভুর স্বরচিত—ইহা শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক।

শ্লো। ৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১৭।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৭। এক্ষণে পাঁচ পয়ারে "তৃণাদপি" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। প্রথমে "তৃণাদপি সুনীচেন—তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ হইয়া নাম করিতে হইবে"—এই অংশের অর্থ করিতেছেন, "উত্তম হঞা" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধে। **উত্তম হঞা**—ধনে, জনে, কুলে, মানে, বিদ্যায়, ভক্তিতে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও। **তৃণাধম**—তুচ্ছ তৃণ অপেক্ষাও হেয়।

বৃক্ষে যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥ ১৮

যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠও যদি হয়, তথাপি সাধক নিজেকে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা হেয় মনে করিবেন।

"তৃণ অত্যন্ত তুচ্ছ পদার্থ; কিন্তু সেই তৃণও গবাদির সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে; গৃহাদি-নির্ম্মাণের সহায়তা করিয়া তৃণ লোকেরও অনেক উপকার করিতেছে; প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষ-ভাবে তৃণদ্বারা ভগবৎ-সেবারও আনুকূল্য হইতেছে; কিন্তু আমাদ্বারা কাহারও কোনও উপকারই সাধিত হইতেছে না, ভগবৎসেবারও কোনওরূপ আনুকূল্য হইতেছে না—সুতরাং আমি তৃণ অপেক্ষাও অধম; আমার মত অধম আর কেহই নাই" ইত্যাদি ভাবিয়া সাধক নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিবেন। অবশ্য এ সব কথা কেবল মুখে বলিলেই চলিবে না—যে পর্য্যন্ত সাধকের চিত্তে এইরূপ ভাবের অনুভূতি না হয়, যে পর্য্যন্ত মনে প্রাণে তিনি নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও হেয় বলিয়া অনুভব না করিবেন, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার "তৃণাদপি সুনীচ" ভাব সিদ্ধ হইবে না।

"দুই প্রকারে" ইত্যাদি সার্দ্ধ দুই পয়ারে "তরোরিব-সহিষ্ণুনা—তরুর মতন সহিষ্ণু হইয়া" অংশের অর্থ করিতেছেন। নাম-গ্রহণকারী তরুর মত সহিষ্ণু হইবেন—তরুর সহিষ্ণুতা দুই রকমের; তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে দেখান হইয়াছে।

১৮। অন্যকৃত দুঃখ সহ্য করার এবং প্রকৃতিদত্ত দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতাই বৃক্ষের দুই রকম সহিষ্ণুতা।

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ ইত্যাদি—কোনও ব্যক্তি যদি বৃক্ষকে কাটিয়া ফেলে, তাহা হইলেও বৃক্ষ তাহাকে কিছুই বলে না, কোনওরূপ আপত্তিও জানায় না, দুঃখও প্রকাশ করে না; এতই বৃক্ষের সহিষ্ণুতা। যিনি নামের ফল পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকেও এইরূপ সহিষ্ণু হইতে হইবে; অপর কেহ যদি তাঁহার কোনওরূপ অনিষ্ট করে, এমনকি তাঁহার প্রাণ-বিনাশ করিতেও আসে, তথাপি তিনি তাহাকে কিছু বলিবেন না—তাহার কার্য্যে কোনওরূপ বাধাও দিবেন না; মনে মনেও অনিষ্টকারীর প্রতি রুষ্ট হইবেন না, কোনওরূপ বিচলিতও হইবেন না। চেতোদর্পণ-শ্লোকে "ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপনম্"-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

শুখাইয়া মৈলে ইত্যাদি—বৃষ্টির অভাবে বৃক্ষ যদি শুকাইয়া মরিয়াও যায়, তাহা হইলেও বৃক্ষ কাহারও নিকটে জল চাহে না, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জলাভাবকষ্ট সহ্য করে—এতই বৃক্ষের সহিষ্ণুতা; নামের মুখ্য ফল পাইতে হইলে সাধককেও এইরূপ সহিষ্ণু হইতে হইবে—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—যে কোনও দুঃখ বিপদই উপস্থিত হউক না কেন, সাধক অবিচলিত চিত্তে অম্লানবদনে তাহা সহ্য করিবেন, দুঃখ-বিপদ হইতে উদ্ধারের আশায় কাহারও নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিবেন না—সমস্তই নিজের কৃতকর্ম্মের ফল মনে করিয়া অবিচলিতচিত্তে সহ্য করিবেন।

শ্রীল হরিদাসঠাকুর এইরূপ সহিষ্ণুতার জলন্ত দৃষ্টান্ত; বাইশবাজারে তাঁহাকে বেত্রদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে প্রহার করা হইল—তিনি কাহারও উপর রুষ্ট হইলেন না, কাহারও নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন না; অম্লানবদনে সমস্তই সহ্য করিলেন, আর মুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

১৯। বৃক্ষের আরও গুণের কথা বলিতেছেন।

যেই যে মাগয়ে—বৃক্ষের নিকটে যে যাহা চায়।

দেয় আপন ধন—তাহাকেই বৃক্ষ নিজের যাহা আছে—পত্র, ডাল, ফল, ফুল যাহা আছে, তাহাই দেয়।

বৃক্ষের নিকটে পত্র-পুষ্পাদি যে যাহা চায়, বৃক্ষ তাহাকেই তাহা দেয়, কাহাকেও বঞ্চিত করে না; এমন কি যে বৃক্ষের ডাল কাটে, এমন কি মূলও কাটে, তাহাকেও ফল, ফুল, পত্র শাখা—সমস্তই দেয়; তাহাকে শত্রুজ্ঞানে

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। | জীবে-সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বঞ্চিত করে না; নাম-সাধককেও এইরূপ বদান্য হইতে হইবে—যে যাহা চাহিবে, নিজের শক্তি-অনুরূপ তাহাকেই তাহা দিবেন; এমন কি, যে ব্যক্তি শত্রুতাচরণ করে, সেও যদি কিছু চাহে, তাহা হইলেও তাহাকে বঞ্চিত করিবেন না, অত্যন্ত প্রীতির সহিত তাহাকেও নিজের শক্তি-অনুরূপ প্রার্থিত-বস্তু দিবেন।

ঘর্ম্ম-বৃষ্টি—যাহাতে ঘর্ম্মের উদ্গম হয় এমন রৌদ্র বা গ্রীষ্ম এবং বৃষ্টি।

ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে ইত্যাদি—বৃক্ষ নিজে রৌদ্রে পুড়িয়া মরিতেছে বা অতি বৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গে সিক্ত হইতেছে, এমন সময়ও যদি কেহ তাহার ছায়ায় বসিয়া তাপ-নিবারণ করিতে চাহে বা তাহার তলে বসিয়া বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে চাহে, তথাপি বৃক্ষ তাহাকে ছায়া বা আশ্রয় দিয়া রক্ষা করে; নিজে কষ্ট সহ্য করিয়াও বৃক্ষ জীবের উপকার করে। নাম-সাধককেও এরূপ হইতে হইবে; নিজে না খাইয়াও অন্নার্থীকে অন্ন দিতে হইবে; নিজে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়াও সাধ্যমত প্রার্থীর সুবিধা করিয়া দিতে হইবে—প্রার্থী যদি নিজের প্রতি শত্রুতাচরণও করে, তাহা হইলেও তাহাকে বঞ্চিত করিবে না; যে লোক বৃক্ষের ডাল কাটে, বৃক্ষ তাহাকেও ছায়া দেয়, আশ্রয় দেয়।

এ পর্য্যন্ত "তরোরিব সহিষ্ণুনা" অংশের অর্থ গেল।

২০। এই পয়ারে "অমানিনা মানদেন"—(নিজে কোনওরূপ সম্মান লাভের আশা না করিয়া অপর সকলকে সম্মান দিয়া) অংশের অর্থ করিতেছেন।

উত্তম হঞা—সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোত্তম হইয়াও। **নিরভিমান**—অভিমানশূন্য। **উত্তম হঞা বৈষ্ণব** ইত্যাদি—ধনে, মানে, কুলে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং ভক্তিতে সর্ব্বোত্তম হইলেও বৈষ্ণবের মনে যেন ধন-মানাদির অভিমান বা গর্ব্ব না থাকে; "আমি ধনী, আমি ভক্ত" ইত্যাদি মনে করিয়া তিনি যেন কাহারও নিকটেই সম্মান-প্রাপ্তির আশা না করেন—মনে মনেও না। তাঁহা অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে নিকৃষ্ট এমন কেহও যদি তাঁহার প্রতি কোনওরূপ অবজ্ঞা দেখায়, তাহা হইলেও তিনি যেন একটুও মনঃক্ষুণ্ণ না হয়েন।

জীবে সম্মান দিবে—জীবমাত্রের প্রতিই সম্মান দেখাইবে। **কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান**—কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত আছেন যাহাতে। কৃষ্ণের অবস্থান।

জীবে সম্মান ইত্যাদি—প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত, ইহা মনে করিয়া বৈষ্ণব, জীবমাত্রের প্রতিই সম্মান দেখাইবেন—কাহাকেও অবজ্ঞা করিবেন না, এমন কি ইতর জন্তুকেও না। "অন্তর্দেহেষু ভূতানামাত্মাস্তে হরিরীশ্বরঃ। সর্ব্বং তদ্ধিষ্ণ্যমীক্ষধ্বমেব বস্তোষিতো হ্যসৌ ॥ শ্রীভা, ৬।৪।১৩॥" প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, সুতরাং প্রত্যেক জীবই ভগবানের শ্রীমন্দিরতুল্য, সুতরাং ভক্তের সম্মানের যোগ্য। শ্রীমন্দির সংস্কারবিহীন, ভগ্ন, বিকৃত, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন হইলেও যেমন ভক্তের নিকটে সম্মানার্হ, কোনও জীব সামাজিক দৃষ্টিতে নীচ হইলেও ভক্তের নিকটে নমস্য; কারণ, তাহার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ আছেন। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুকুর অন্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি ॥—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য। ৩। প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্। শ্রীভা, ১১।২৯।১৬॥ টীকা—অন্তর্য্যামীশ্বরদৃষ্ট্যা সর্ব্বান্ প্রণমেৎ॥ স্বামী॥ শ্বচাণ্ডালাদীনভিব্যাপ্য অন্তর্য্যামীশ্বরদৃষ্ট্যা প্রণমেৎ॥ শ্রীজীব॥—অন্তর্য্যামী-ঈশ্বরদৃষ্টিতে—সকলের মধ্যেই অন্তর্য্যামিরূপে ঈশ্বর আছেন, এইরূপ মনে করিয়া—চণ্ডাল, কুকুর, গো এবং গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সকলকেই ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে। মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥ শ্রীভা, ৩।২৯।৩৪॥ টীকা—জীবানাং কলয়া পরিকলনেন অন্তর্য্যামিতয়া প্রবিষ্ট ইতি দৃষ্ট্যা ইত্যর্থঃ॥ স্বামী॥ জীবকলয়া তদন্তর্য্যামিতয়া ইত্যর্থঃ॥

এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয় ॥ ২১

কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাঢ়িলা।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীজীব ॥—অন্তর্য্যামিরূপে ঈশ্বর ভগবান্ সকল জীবের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এইরূপ মনে করিয়া মনের দ্বারা (আন্তরিক ভাবে) বহু সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সমস্ত জীবকেই প্রণাম করিবে।"

২১। **এই মত হঞা**—পূর্ব্বোক্তরূপ হইয়া। নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও হেয় মনে করিয়া, বৃক্ষের ছায় সহিষ্ণু হইয়া, সর্ব্বোত্তম হইয়াও নিজে সম্মানের আশা না করিয়া এবং সর্ব্বজীবের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া সকলকে সম্মান করিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারেন।

এস্থলে, যে ভাবে হরি-নাম গ্রহণ করিলে প্রেম জন্মিতে পারে বলা হইল, সেই ভাবটী মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে সহজলভ্য নহে; ইহাও সাধন-সাপেক্ষ; এই ভাবটী পাওয়ার নিমিত্ত শ্রীভগবানের চরণে এবং শ্রীনামের নিকটে কাতর প্রার্থনা জানাইয়া মনে প্রাণে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে—নিরন্তর শ্রীনাম গ্রহণ করিলে—নামেরই কৃপায় সাধকের চিত্তে "তৃণাদপি" শ্লোকানুরূপ ভাব জন্মিতে পারে; তখনই নামগ্রহণের ফলে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে।

এই গ্রন্থেরই অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,—"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥ প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার॥ অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন। হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার। তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥ তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর। কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥ ১৮৷২২-২৬॥"

যাঁহার নাম-অপরাধ আছে, শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহারও নামাপরাধ দূরীভূত হইতে পারে। অপরাধ দূরীভূত হইলেই প্রেমোদয়ের সম্ভাবনা জন্মিবে।

যাঁহার বৈষ্ণব-অপরাধ নাই, একবার কৃষ্ণ-নাম গ্রহণ করিলেই তাঁহার চিত্তে প্রেমের উদয় হয়; কিন্তু যাঁহার অপরাধ আছে, বহুবার নাম-গ্রহণ করিলেও তাঁহার প্রেমোদয় হয় না। ইহাতেও অপরাধী ব্যক্তির হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নাই। যাঁহার চরণে অপরাধ হইয়াছে, জানা থাকিলে আন্তরিকতার সহিত তাঁহার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিলেই অপরাধ দূরীভূত হইবে। আর কোথায় অপরাধ হইয়াছে, তাহা যদি জানা না থাকে, তবে একান্তভাবে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তৃণাদপি শ্লোকের মর্ম্মানুসারে নিরন্তর নাম গ্রহণ করিলেই শ্রীনামের কৃপায় অপরাধ দূরীভূত হইতে পারে, অপরাধ দূরীভূত হইলেই প্রেমোদয়ের সম্ভাবনা জন্মিবে।

যাঁহার কোনও অপরাধ নাই, "তৃণাদপি" শ্লোকানুরূপ চিত্তের অবস্থা তাঁহার সহজেই জন্মিয়া থাকে। অপরাধীর পক্ষে ইহা সময়-সাপেক্ষ।

যতক্ষণ দেহেতে আবেশ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই বিদ্যা, কুল, ধন, সম্পত্তি-আদির অভিমান থাকে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তে কোনওরূপ অভিমান থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ তৃণ অপেক্ষা সুনীচও হইতে পারে না, তরুর ছায় সহিষ্ণুও হইতে পারে না, মান-সম্মানের আশাও ত্যাগ করিতে পারে না, সকল জীবকে সম্মানও দিতেও পারে না এবং অপরাধের বীজও ততক্ষণ তাহার মধ্যে থাকিবে। তৃণাদপি-শ্লোকে প্রভু যাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে—অভিমান অর্থাৎ দেহাবেশ ত্যাগ।

২২। **কহিতে কহিতে**—তৃণাদপি শ্লোকের অর্থ বলিতে বলিতে। দৈন্য ও বিষাদের সহিতই প্রভু তৃণাদপি শ্লোকটী বলিয়াছিলেন; উহার অর্থ করিতে করিতে, প্রেমের স্বভাববশতঃ তাঁহার মনে হইল,—তৃণাদপি-শ্লোকানুরূপ চিত্তের অবস্থা তাঁহার নাই; তাই যেভাবে নাম গ্রহণ করিলে প্রেমের উদয় হইতে পারে, সেইভাবে তিনি নাম গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, তাই তাঁহার চিত্তে প্রেমের উদয়ও হইতেছে না। তাঁহার চিত্তে প্রেমের

প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সে-ই মানে—কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেমগন্ধ॥ ২৩

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৯৫)—
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ ৬

ধন জন নাহি মাগোঁ—কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ! কৃপা করি॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ন ধনমিতি। হে জগদীশ! হে জগন্নাথ! ত্বয়ি ভগবতি ঈশ্বরে মম জন্মনি জন্মনি অহৈতুকী হেতুরহিতা শুদ্ধা ইত্যর্থঃ ভক্তিঃ ভবতাৎ ভবত্বিত্যর্থঃ। ধনং স্বর্ণরত্নাদিকং জনং পরিচারকাদিকং সুন্দরীং অপ্সরাসদৃশীভার্য্যাদিকং কবিতাং কাব্যরচনাশক্তিং ন কাময়ে ন যাচেঽহং ইত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অভাব মনে করিয়া ভক্তভাবাবিষ্ট প্রভুর দৈন্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। তাই প্রভু নিম্নোদ্ধৃত "ন ধনং ন জনং" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের চরণে শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করিলেন।

শুদ্ধভক্তি—নির্গুণা ভক্তি; কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী ভক্তি। যে ভক্তিতে কৃষ্ণসেবার বাসনাব্যতীত অন্য কোনও বাসনাই চিত্তে থাকেনা। এই ভক্তির সাধন-জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা আবৃত নহে, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূল অনুশীলনময়। "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা—ভঃ রঃ সিঃ।" শুদ্ধা ভক্তিই প্রেম।

২৩। প্রভুর চিত্তে যে বাস্তবিকই শুদ্ধাভক্তি বা প্রেম ছিল না, তাহা নহে; পরন্তু প্রেমের একটী স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, যাঁহার চিত্তে প্রেম আছে, তিনি সর্ব্বদাই মনে করেন—তাঁহার চিত্তে প্রেম তো দূরের কথা, প্রেমের গন্ধমাত্রও নাই। তাই, প্রেমময় তনু হইয়াও প্রভু প্রেমের অভাব অনুভব করিতেছেন।

প্রেমের স্বভাব—প্রেমের প্রকৃতি, প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্ম। **যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ**—যাঁহার মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ আছে; যাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আছে। **সে-ই মানে**—যাঁহার চিত্তে প্রেম আছে, তিনিই প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ মনে করেন যে। **কৃষ্ণে মোর** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণে প্রেমের লেশমাত্রও আমার নাই।

প্রেমের-অভাব-জ্ঞান জন্মাইয়া দেওয়াই প্রেমের একটী স্বরূপগত ধর্ম্ম। তাই, শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিয়াছেন—"দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ কপট-প্রেমের বন্ধ, সেহো মোর নাহি কৃষ্ণ পায়।"

শ্লো। ৬। অন্বয়। জগদীশ (হে জগদীশ)! ধনং ন (ধনওনা) জনং ন (জনওনা) সুন্দরীং কবিতাং বা ন (সুন্দরী পত্নী—বা সালঙ্কারা কবিতাও না) কাময়ে (যাচ্ঞা করি); ঈশ্বরে ত্বয়ি (ঈশ্বর তোমাতে) মম (আমার) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) অহৈতুকী (অহৈতুকী) ভক্তিঃ (ভক্তি) ভবতাৎ (থাকুক)।

অনুবাদ। হে জগদীশ! আমি তোমার চরণে ধন যাচ্ঞা করি না, জন যাচ্ঞা করি না; (সুন্দরী পত্নী, অথবা) সালঙ্কারা কবিতাও যাচ্ঞা করি না; আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে—ঈশ্বর-তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। ৬

২৪। এই পয়ারে "ন ধনং ন জনং" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। "ন ধনং ন জনং" শ্লোকটীও প্রভুর স্বরচিত; ইহা শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোক।

ধনজন নাহি মাগোঁ—হে জগদীশ! তোমার চরণে আমি ধন কিম্বা জন মাগি না (প্রার্থনা করি না)। **কবিতা সুন্দরী**—সুন্দরী কবিতা; সালঙ্কারা কবিতা; লোকের চিত্তমুগ্ধকারিণী কবিত্ব-শক্তিও প্রার্থনা করি না। **অথবা,** কবিতা এবং সুন্দরী; কবিত্বশক্তি এবং সুন্দরী স্ত্রীও প্রার্থনা করি না। কবিতা-স্থলে "কবিত্ব" পাঠান্তরও

অতি দৈন্যে পুন মাগে দাস্যভক্তিদান। | আপনাকে করে সংসার-জীব অভিমান ॥ ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আছে। **শুদ্ধভক্তি** ইত্যাদি—হে কৃষ্ণ! কৃপা করিয়া তুমি আমাকে শুদ্ধভক্তি দাও, ইহাই তোমার চরণে প্রার্থনা করি।

"হে জগদীশ! তুমি ইচ্ছা করিলে, যে যাহা চাহে তাহাকে তাহাই দিতে পার। কিন্তু প্রভু, আমি তোমার চরণে অপর কিছু চাহি না—চাহি কেবল শুদ্ধাভক্তি। আমি তোমার চরণে ধনরত্নাদি প্রার্থনা করি না, (কারণ, ধনমদে মত্ত হইয়া জীব তোমার সম্বন্ধে যেন অন্ধ হইয়া যায়, তোমার কথা ভুলিয়াই যায়); পুত্র-কন্যা-পরিচারকাদিও প্রার্থনা করি না (কারণ, পুত্র-কন্যাদি মিথ্যাবস্তুতে অভিনিবেশ জন্মিলে সত্যবস্তু তোমা হইতে আরও দূরে সরিয়া যাইতে হইবে); মনোরম কাব্যরচনা-শক্তিও (নানালঙ্কারময় কাব্য-রচনা শক্তিও; অথবা সুন্দরী স্ত্রী বা কবিত্ব-শক্তিও) আমি চাহি না (তাতে বৃথা গর্ব্ব ও বৃথা আবেশ মাত্র জন্মে)—অন্য কিছুই আমি চাহি না; চাহি কেবল শুদ্ধাভক্তি; পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ! তুমি কৃপা করিয়া তাই কর, যাহাতে জন্মে জন্মে তোমার চরণে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।"

শ্লোকস্থ "মম জন্মনি জন্মনি" অংশ হইতে বুঝা যায়, শুদ্ধভক্ত জন্মমৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রার্থনাও ভগবচ্চরণে করেন না। শ্রীপ্রহ্লাদও শ্রীনৃসিংহদেবের চরণে এইরূপ প্রার্থনাই করিয়াছিলেন:——"নাথ! জন্মসহস্রেষু যেষু যেষু ভবাম্যহম্। তেষু তেষ্বচ্যুতাভক্তিরচ্যুতাস্তি সদা ত্বয়ি॥—বিঃ পুঃ। ১৷২০৷১৮॥"—হে প্রভো! আমার কর্ম্মফল অনুসারে আমাকে তো সহস্র সহস্র যোনিই ভ্রমণ করিতে হইবে; কিন্তু যখন যে যোনিতেই জন্মি না কেন, হে অচ্যুত! সর্ব্বদা তোমার চরণে যেন আমার অচ্যুতা ভক্তি থাকে।"

জন্মমৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাওয়ার প্রার্থনায় স্বসুখ-বাসনা বা নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির বাসনা আছে, ইহা শুদ্ধাভক্তির প্রতিকূল। ধন-জন-কবিতাদির প্রার্থনায়ও স্বীয় ভোগ-সুখই লক্ষ্য থাকে, তাই ইহাও শুদ্ধাভক্তির প্রতিকূল। শুদ্ধাভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণসেবার কামনা ব্যতীত অপর কিছুই থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ-সেবার কামনায় যদি নিজের সুখ বা দুঃখনিবৃত্তির অভিলাষ থাকে, তবে সেই শ্রীকৃষ্ণ-সেবার কামনাও শুদ্ধাভক্তির প্রতিকূল। যে পর্য্যন্ত চিত্তে ভুক্তি-মুক্তির স্পৃহা থাকিবে, সে পর্য্যন্ত শুদ্ধাভক্তি জন্মিতে পারে না। "ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ১৷২৷১৫॥"

২৫। শুদ্ধাভক্তির প্রার্থনা করিতে করিতে প্রভুর চিত্তে দৈন্যভাব অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল—উদ্ঘূর্ণাবশতঃ ভক্তভাবে তিনি মনে করিলেন, তিনি মায়াবদ্ধ জীব; জীবমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস—কিন্তু তাহা ভুলিয়া, কৃষ্ণকে ভুলিয়া, তিনি মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া বিষম সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া যেন হাবুডুবু খাইতেছেন। তাই অত্যন্ত দৈন্যের সহিত তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণে দাস্য-ভক্তি প্রার্থনা করিলেন (নিম্নোদ্ধৃত "অয়ি নন্দ-তনুজ" শ্লোক)। **পুন মাগে**—প্রভু পুনরায় প্রার্থনা করিলেন। **দাস্যভক্তি**—যে ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দাস বা সেবকরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা যায়, তাহা। **দাস্যভক্তি দান**—শ্রীকৃষ্ণ-চরণে দাস্যভক্তিদান প্রার্থনা করিলেন; শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহাকে যেন দাস্যভক্তি দেন, ইহাই প্রার্থনা করিলেন। **আপনাকে**—শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেকে। **সংসার-জীব অভিমান**—প্রভু নিজেকে মায়াবদ্ধ সংসারী জীব বলিয়া মনে করিলেন। মায়াবদ্ধ সংসারী জীবকে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বোধহয় প্রভুর কৃপাশক্তি তাঁহাতে এইরূপ অভিমান প্রকটিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রভু সংসারী জীব নহেন—তিনি জীবই নহেন, তিনি অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্।

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (১৭)—
অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥ ৭

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥ ২৬

কৃপা করি কর মোরে পদধূলিসম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥ ২৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অয়ীতি। অয়ি কাতরে হে নন্দতনুজ নন্দাত্মজ! তব কিঙ্করং বিষমে ভবাম্বুধৌ অপার-সংসার-সমুদ্রে পতিতং মজ্জিতং মাং কৃপয়া করণভূতয়া পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং নিজপাদপদ্মাশ্রিত-রেণুতুল্যং বিচিন্তয় নিজদাসং কুরু ইত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অয়ি নন্দতনুজ (হে নন্দনন্দন)! বিষমে ভবাম্বুধৌ (বিষম-সংসার সমুদ্রে) পতিতং (পতিত) কিঙ্করং (তোমার কিঙ্কর) মাং (আমাকে) কৃপয়া (কৃপা করিয়া) তব (তোমার) পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং (পাদপদ্মস্থিত ধূলিতুল্য) বিচিন্তয় (বিবেচনা কর)।

অনুবাদ। অয়ি নন্দতনুজ! বিষম-সংসার-সমুদ্রে নিপতিত, তোমারই কিঙ্কর আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিতুল্য বিবেচনা কর। ৭

২৬। এক্ষণে দুই পয়ারে "অয়ি নন্দতনুজ" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। এই শ্লোকটীও প্রভুর স্বরচিত; ইহা শিক্ষাষ্টকের পঞ্চম শ্লোক। **তোমার নিত্যদাস**—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। **তোমা পাসরিয়া**—শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া। **পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে**—আমি (প্রভু) সংসার-সমুদ্রে পড়িয়াছি। **মায়াবদ্ধ হঞা**—মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করায়, মায়াকর্তৃক সংসারে আবদ্ধ হইয়া।

"হে কৃষ্ণ! আমি জীব; তাই স্বরূপতঃ আমি তোমার নিত্যদাস; তোমার সেবা করাই আমার স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য; কিন্তু অনাদিকাল হইতেই আমি তোমাকে ভুলিয়া মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া মায়িক সুখভোগের জন্য লুব্ধ হইয়াছি; তাই মায়াবদ্ধ হইয়া আমি সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়াছি।"

জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস; কিন্তু জীব তাহা ভুলিয়া অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া রহিয়াছে। তাই মায়া তাহাকে সংসার দুঃখ দিতেছে। "জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস। ২।২০।১০১। কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥" ২।২০।১০৪।" প্রভু নিজেকে মায়াবদ্ধ সংসারী জীব মনে করিয়া নিজের সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিতেছেন।

এই পয়ারে শ্লোকস্থ "অয়ি নন্দতনুজ" ইত্যাদি অংশের অর্থ।

২৭। প্রভু বলিলেন—"হে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমারই দাস; দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমার সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি; প্রভো! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার সেবক করিয়া লও; যেন সর্ব্বদাই, তোমার চরণের আশ্রয়ে থাকিয়া, তোমার চরণ-সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি—তাহাই দয়া করিয়া কর প্রভো!"

পদধূলিসম—চরণধূলির মতন; ইহা "পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশম্"-অংশের অর্থ। পদস্থিত-ধূলি যেমন পদ ছাড়িয়া অন্যত্র থাকে না, তদ্রূপ আমিও যেমন সর্ব্বদা তোমার চরণের আশ্রয়ে থাকিতে পারি, কখনও যেন তোমার চরণ-ছাড়া না হই। **তোমার সেবক**—আমি স্বরূপতঃ তোমারই দাস। **করোঁ তোমার সেবন**—তোমার চরণাশ্রয়ে থাকিয়া তোমার সেবা করিব।

এই পয়ারে শ্লোকস্থ "কৃপয়া তব" ইত্যাদি অংশের অর্থ

পুন অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হইল উদ্গম।
কৃষ্ণ-ঠাঁই মাগে সপ্রেম-নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৮

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৯৪)—
নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥

প্রেমধন বিনু ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥ ২৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নয়নমিতি। হে প্রভো কদা কস্মিন্‌কালে তব নামগ্রহণে কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি নামোচ্চারণে গলদশ্রুধারয়া নিচিতং যুক্তং নয়নং ভবিষ্যতি, গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা নিচিতং বদনং ভবিষ্যতি, পুলকৈঃ নিচিতং বপুঃ ভবিষ্যতি। শ্লোকমালা। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৮। কৃষ্ণসেবার প্রার্থনা করিয়াই প্রভুর বোধ হয় মনে হইল যে, প্রেমগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন করিতে না পারিলে তো শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যাইতে পারে না, তাই তিনি অত্যন্ত দৈন্য ও উৎকণ্ঠার সহিত সপ্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সৌভাগ্য প্রার্থনা ("নয়নং গলদশ্রু" ইত্যাদি শ্লোকে) করিলেন। এখনও প্রভুর সংসারি-জীব-অভিমান রহিয়াছে।

উৎকণ্ঠা—সপ্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা। **দৈন্য**—সপ্রেম-নামসঙ্কীর্ত্তনের সৌভাগ্য হইতে এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন বলিয়া দৈন্য। **কৃষ্ণ-ঠাঁই**—কৃষ্ণের নিকটে। **সপ্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তন**—প্রেমের সহিত নামসঙ্কীর্ত্তন।

শ্লো। ৮। অন্বয়। কদা (কখন—কোন সময়ে) তব (তোমার) নামগ্রহণে (নাম গ্রহণ করিতে) নয়নং (নয়ন) গলদশ্রুধারয়া (বিগলিত অশ্রুধারায় ব্যাপ্ত হইবে) বদনং (বদন) গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা (গদ্‌গদবাক্যে রুদ্ধ হইবে) বপুঃ (দেহ) পুলকৈঃ (পুলকদ্বারা) নিচিতং (পরিব্যাপ্ত) ভবিষ্যতি (হইবে)।

অনুবাদ। হে ভগবান্! এমন দিন আমার কখন আসিবে—যখন তোমার নাম-গ্রহণ করিতে বিগলিত অশ্রুধারায় আমার নয়ন পরিব্যাপ্ত হইবে, বদন গদ্‌গদ্‌বাক্যে রুদ্ধ হইবে, সমস্ত দেহ পুলকদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইবে? ৮

ভক্তভাবে প্রভু প্রার্থনা করিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! এমন সৌভাগ্য আমার কখন হইবে যে, তোমার নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে আমার নয়ন হইতে অনর্গল অশ্রু নির্গত হইবে, আমার কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ্‌বাক্যে রুদ্ধ হইবে এবং আমার দেহ পুলকাবলীতে পরিব্যাপ্ত হইবে? অর্থাৎ নামগ্রহণ করিতে করিতে কখন আমার দেহে রোমাঞ্চ-অশ্রু-আদি সাত্ত্বিক-বিকারের উদয় হইবে?" এসমস্ত সাত্ত্বিক বিকার প্রেমোদয়ের লক্ষণ; তাই এই শ্লোকে প্রভু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই এবং সেই প্রেমভরে শ্রীনামকীর্ত্তনের সৌভাগ্যই প্রার্থনা করিতেছেন বলিয়া বুঝা যায়।

"নয়নং গলদশ্রু" শ্লোকটীও প্রভুর স্বরচিত; এই শিক্ষাষ্টকের ষষ্ঠ শ্লোক।

২৯। প্রেমধন বিনু—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমরূপ-ধন ব্যতীত।

ব্যর্থ—বৃথা; সার্থকতা শূন্য।

প্রেমধন বিনু ব্যর্থ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ-সেবাতেই জীবনের সার্থকতা; কিন্তু প্রেম ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-সেবাও সম্ভব নহে; সুতরাং যাঁহার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম নাই, তাহার জীবনই ব্যর্থ, তাহার জীবনের কোনও সার্থকতাই নাই; কারণ, সে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা হইতে বঞ্চিত; আর তাহার মত দরিদ্রও কেহ নাই; কারণ, যার প্রেম নাই, সুতরাং যাহার কৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য নাই—তাহার কিছুই নাই। আর যাঁর প্রেম আছে, তাঁর সমস্তই আছে—কারণ, তাঁর কৃষ্ণ আছেন; তিনি প্রেমধনে ধনী,—সমস্তের আশ্রয় এবং নিদান যে শ্রীকৃষ্ণ—সেই কৃষ্ণধনে তিনি ধনী।

দাস করি ইত্যাদি—দাস (ভৃত্য) প্রভুর সেবা করে; প্রভু তাহাকে বেতন (মাহিনা) দেন। ভক্তভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! হে আমার প্রভো! তুমি আমাকে তোমার দাস (ভৃত্য) করিয়া তোমার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেবায় নিয়োজিত কর; আমার প্রাপ্য বেতনরূপে আমাকে তোমাতে প্রেম দান করিও; তোমাতে প্রেমব্যতীত অন্য কোনও বেতন আমি চাহি না।"

এস্থলে "বেতন" চাওয়াতে স্বার্থানুসন্ধান সূচিত হয় নাই; কারণ, বেতনরূপে প্রভু কৃষ্ণপ্রেমই প্রার্থনা করিয়াছেন—কৃষ্ণপ্রেমের তাৎপর্য্য, কৃষ্ণসুখার্থে কৃষ্ণসেবা—নিজের সুখলাভ নহে। "বেতন"-স্থলে "বর্ত্তন"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। অর্থ একই।

প্রেমদাতা কে? আজকাল কেহ কেহ বলিতে চাহেন—কোনও লোক যেমন পদ্মের (উপলক্ষণে মধু-বহনকারী অন্যান্য ফুলের) নিকট হইতে মধু আহরণ করিতে পারে না, পদ্ম যেমন কোনও লোককে মধু দেয় না, মধুকর কর্ত্তৃক আহরিত মধুই লোকে পাইতে পারে, তদ্রূপ ভগবানের নিকট হইতেও কেহ প্রেম লাভ করিতে পারে না, ভগবান্ কাহাকেও প্রেম দেন না, ভক্তের নিকটেই প্রেম পাওয়া যায়। এই উক্তি কতটুকু বিচারসহ, তাহা বিবেচনা করা যাউক।

(ক) আলোচ্য পয়ারে ভক্তভাবে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের নিকটেই "প্রেমধন" প্রার্থনা করিলেন। "দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥" শ্রীকৃষ্ণ যদি কাহাকেও প্রেম না-ই দেন, অথবা তিনি যদি প্রেম দিতে না-ই পারেন, কেহ যদি তাঁহার নিকটে প্রেম না-ই পায়, তাহা হইলে প্রভুর এই প্রার্থনাই নিরর্থক হইয়া পড়ে। প্রভু নিরর্থক বাক্য বলেন নাই।

(খ) শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ বর্ত্তমান থাকিলেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই প্রেম দান করিতে পারেন না; শ্রীকৃষ্ণ লতাগুল্মকে পর্য্যন্ত প্রেম দান করিতে পারেন। "সন্ত্যবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কোবা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥" স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥ ১।৩।২০॥" তিনি আরও বলিয়াছেন—"চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান। ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥ ১।৩।১২॥" ইহাতেও বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপই যে প্রেম দিতে পারেন না, কেবল তাহাই নহে, তিনি কোনও সময়ে—বহুকাল পূর্ব্বে—প্রেম দিয়াছেনও।

উপপুরাণও বলেন,—শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন—"অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥ ১।৩।১৫ শ্লোক।" ইহা হইতে জানা যায়, কোনও বিশেষ কলিতে (ক্বচিৎ কলৌ) শ্রীকৃষ্ণ হরিভক্তি (প্রেম) দিয়া থাকেন। হরিভক্তি লাভের উপায় জানাইবার কথা এই শ্লোকে বলা হয় নাই, হরিভক্তি দানের কথাই বলা হইয়াছে। "হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি।

এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণই প্রেম দিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রেম দিয়াও থাকেন।

(গ) ব্রজপ্রেম দান করার নিমিত্তই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের আশ্রয়-স্বরূপ তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপ এই কলিতে জগতে প্রকটিত করিয়াছেন। "অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণায়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিঃ কদম্বসন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"; এবং অধিকারী অনধিকারী বিচার না করিয়া আপামর সাধারণকে প্রেম দিয়াছেনও; ঝারিখণ্ড-পথে স্থাবর-জঙ্গমাদিকে পর্য্যন্তও তিনি প্রেম দিয়াছেন।

(ঘ) প্রেমবস্তুটী হইল শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। "হ্লাদিনীর সার প্রেম।" হ্লাদিনী হইল শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তি, তাহা শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থিত। জীবে এই হ্লাদিনী শক্তি নাই (১।৪।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই হইলেন প্রেমের মূল উৎস, মূল আধার। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ প্রেম দিতে পারেন না।

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ যে প্রেম দিতে পারেন না, তাহার হেতুও আছে। যাঁহার অধিকারে যে বস্তু থাকে, তিনি সেই বস্তুই দিতে পারেন; যাঁহার অধিকারে যে বস্তু নাই, তিনি সেই বস্তু দিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপগণের ধাম হইল পরব্যোমে (বা বৈকুণ্ঠে)। পরব্যোম হইল ঐশ্বর্য্য-প্রধান ধাম, এই ধামে ঐশ্বর্য্যেরই সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য; সুতরাং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন এবং মমত্ববুদ্ধিময় বিশুদ্ধ প্রেম পরব্যোমে থাকিতে পারে না। এজন্যই পরব্যোমের কোনও ভগবৎ-স্বরূপই—এমন কি পরব্যোমাধিপতি নারায়ণও বিশুদ্ধ প্রেম দিতে পারেন না; যেহেতু, এই জাতীয় প্রেম তাঁহাদের অধিকারে নাই। দ্বারকা-মথুরাতেও ঐশ্বর্য্যের ভাব আছে; তত্রত্য পরিকরগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন প্রেম নাই, তাঁহাদের প্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত; সুতরাং দ্বারকা বা মথুরাতেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন বিশুদ্ধ প্রেম নাই। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন এবং মমত্ববুদ্ধিময় বিশুদ্ধ প্রেমের স্থান একমাত্র স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল ব্রজধাম। সুতরাং ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণই ব্রজপ্রেম বা বিশুদ্ধ প্রেম দিতে পারেন, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ তাহা পারেন না। এই পয়ারে এবং অন্যত্রও "প্রেম" বলিতে "ব্রজপ্রেম" বা "ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধিময় এবং কামগন্ধলেশশূন্য বিশুদ্ধ প্রেমই" সূচিত হইয়াছে। ইহা একমাত্র ব্রজেরই সম্পত্তি।

(ঙ) প্রকটলীলাতে সাক্ষাদ্‌ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ প্রেম দিয়া থাকেন; গৌরস্বরূপে সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়াও তিনি প্রেম দিয়াছেন এবং স্বীয় পার্ষদগণের দ্বারাও দেওয়াইয়াছেন। কিন্তু লীলার অন্তর্দ্ধানে সাধারণতঃ ভজনের সহায়তাতেই এই প্রেম পাওয়া যায়। "সাধন-ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়॥ ২।১৯।১৫১॥" এই প্রেম হইল নিত্যসিদ্ধ বস্তু; সাধনের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতে প্রেমের আবির্ভাব হয়। "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদিশুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥ ২।২২।৫৭॥ কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥ ভ, র, সি, ১।২।২॥" কিন্তু শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে প্রেম কোথা হইতে আসে? আসে শ্রীকৃষ্ণ হইতে। শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনী-শক্তিরই কোনও এক সর্ব্বানন্দাতি-শায়িনী বৃত্তিকে সর্ব্বদাই ভক্তবৃন্দের চিত্তে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন; তাহাই ভক্তচিত্তে গৃহীত হইয়া প্রেমরূপে বিরাজিত থাকে। "তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। প্রীতিসন্দর্ভ। ৬৫॥" ২।২২।৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এইরূপে দেখা গেল, সাধক ভক্তের চিত্ত কোনও এক বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তিনি যে প্রেম লাভ করেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ হইতেই আসে এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেই প্রেম দিয়া থাকেন।

(চ) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—কৃষ্ণরতি (বা ভাব, যাহা প্রেমরূপে পরিণত হয়, তাহা) প্রাথমিক-সৎসঙ্গজাত-মহাভাগ্য সাধকগণ দুই প্রকারে লাভ করেন—এক সাধনে অভিনিবেশ হইতে; আর কৃষ্ণের ও কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহ (প্রসাদ) হইতে। তন্মধ্যে সাধনাভিনিবেশ হইতেই প্রায় সকলে এই রতি বা ভাব লাভ করেন; কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহজাত রতি অতি বিরল। "সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণ-তদ্‌ভক্তয়োস্তথা। প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বিধাভিজায়তে। আদ্যস্তু প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ো বিরলোদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ১।৩।৫॥" এস্থলে প্রথমে সাধনাভি-নিবেশের কথা বলিয়া তাহার পরে কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তের কৃপার কথা বলায় ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, সাধনাভিনিবেশ ব্যতীতও কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণভক্তের কৃপাতে কৃষ্ণরতি লাভ হইতে পারে—ইহা হইল শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণভক্তের সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুগ্রহ সাধারণতঃ প্রকট-লীলাতেই সম্ভব। অপ্রকটে যে তাহা একেবারেই সম্ভব নয়, তাহা নহে; ক্বচিৎ কোনও ভাগ্যবানের সেই সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে; তাই ইহাকে "বিরলোদয়" বলা হইয়াছে। যাঁহার সাধনে অভিনিবেশ নাই, তাঁহার চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনাও নাই; সুতরাং সাধারণ-ভাবে তাঁহার পক্ষে প্রেমলাভের সম্ভাবনাও নাই। তথাপি, শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপা উদ্‌বুদ্ধ হইলে স্বীয় অচিন্ত্য-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শক্তির প্রভাবে তাঁহার চিত্তকেও শুদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রেম দিতে পারেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইল সাধনাভিনিবেশের অপেক্ষা না রাখিয়া চিত্তশুদ্ধি-করণ-বিষয়ে বিশেষ কৃপা; ইহা প্রেমদান-বিষয়ে বিশেষ কৃপা নহে; যেহেতু, ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাহীন বিশুদ্ধ-চিত্ত জীবকে প্রেম দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ব্যাকুল। "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব॥" তিনি আপনা হইতেই তাঁহার হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তি-বিশেষকে সর্ব্বদিকে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন—তাহা যেন বিশুদ্ধ-চিত্ত ভক্তের হৃদয়ে গৃহীত হইয়া প্রেমরূপে বিরাজিত থাকিতে পারে (প্রীতিসন্দর্ভ। ৬৫)।

তারপর কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহ। কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহজাত রতিকেও "বিরলোদয়" বলা হইয়াছে। তাহার হেতুও বোধ হয় উল্লিখিত রূপই। প্রকট-লীলাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পার্যদ-ভক্তদের দ্বারা অনর্গল প্রেমভক্তি বিতরণ করাইয়াছেন; এই প্রেম-বিতরণে সাধন-ভজনের অপেক্ষা রাখা হয় নাই। ইহা হইল মহাপ্রভুর প্রকট-লীলার বৈশিষ্ট্য। তখন ইহা "বিরলোদয়" ছিল না। কিন্তু প্রভুর লীলার অন্তর্দ্ধানের পরে ইহা হইয়া যায় "বিরলোদয়"। যাহা হউক, কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহে সাধনাভিনিবেশহীন লোকও যে কৃষ্ণরতি লাভ করেন, তাহা কি ভাবে সম্ভব? কোনও কৃষ্ণভক্ত যদি কোনও ভাগ্যবানের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার প্রেমপ্রাপ্তি কামনা করেন, তাহা হইলে ভক্তবৎসল এবং ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ সেই ভাগ্যবান্‌কে প্রেম দিয়া সেই কৃষ্ণভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন। কোনও কৃষ্ণভক্ত এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভগবান্ তাহা অপূর্ণ রাখেন না; যেহেতু, ভক্তচিত্ত-বিনোদনই তাঁহার একটী ব্রত। "মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।"—ইহা তাঁহার শ্রীমুখোক্তি। বাসুদেব দত্ত জগতের সমস্ত জীবের পাপের ভার গ্রহণ করিয়া নরক-ভোগ করিতেও ইচ্ছা করিয়াছিলেন—তাহাদের উদ্ধারের জন্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"বাসুদেব, তুমি যখন সমস্ত জীবের উদ্ধার কামনা করিয়াছ, পরম-কৃপালু ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবকেই উদ্ধার করিবেন; তোমার নরকভোগ করিতে হইবে না।" এস্থলে সমস্ত জীবের প্রতি বাসুদেব-দত্তের কৃপা হইল—তাহাদের উদ্ধারের জন্য তাঁহার ইচ্ছা। উদ্ধার করিবেন—শ্রীকৃষ্ণ। বাসুদেব দত্তের কৃপা হইল জীবগণের উদ্ধারের পরম্পরাগত হেতুমাত্র; কৃষ্ণের অপেক্ষা না রাখিয়া বাসুদেব নিজে জীবদিগকে উদ্ধার করেন নাই; তদ্রূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করেন নাই।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীগোস্বামী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর সেবা করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রতি "তুষ্ট হঞা (মাধবেন্দ্র) পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। বর দিল—কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন॥ ৩৮।২৯॥" শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের অনুগ্রহের ফলে "সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর॥ ৩৮।৩০॥" "ঈশ্বরপুরীর প্রেমলাভ হউক"—ইহাই হইল তাঁহার প্রতি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের অনুগ্রহ।

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে প্রেমভক্তি দেওয়ার জন্য শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুকে বলিলেন—"অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ এ-দোঁহারে। জন্ম জন্ম যেন আর কৃষ্ণ না পাসরে॥ ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, বিনে তুমি দিলে। কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণ কারে মিলে॥" তখন শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য বলিয়াছিলেন —"প্রভু, সর্ব্বদাতা তুমি। তুমি আজ্ঞা করিলে সে দিতে পারি আমি॥ প্রভু আজ্ঞা করিলে সে ভাণ্ডারী দিতে পারে। এইমত যারে কৃপা কর যার দ্বারে॥ কায়-মন-বচনে মোর এই কথা। এ-দুইর প্রেমভক্তি হউক সর্ব্বথা॥ শ্রীচৈ, ভা, অন্ত্য ৯ম অধ্যায়॥" শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যকে বলিলেন "ভক্তির ভাণ্ডারী॥" শ্রীমদদ্বৈত-প্রভু বলিলেন—"আমি যদি ভাণ্ডারীই হই, ভাণ্ডারের প্রভু (মালিক) কিন্তু তুমি; তুমি আদেশ করিলেই আমি ভাণ্ডারের দ্রব্য বিতরণ করিতে পারি।" বাস্তবিক মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধিকাই অখণ্ড-প্রেমের মূর্ত্ত বিগ্রহ বা ভাণ্ডার। তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াই রাই-কানু-মিলিত-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সেই প্রেমের ভাণ্ডার-স্বরূপ হইয়াছেন। তিনি "পূর্ব্বপ্রেম-ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া" স্বীয় পার্ষদবৃন্দের সহিত আস্বাদন করিয়াছেন এবং যত্র-তত্র এই প্রেম

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিতরণের জন্য স্বীয় পরিকরবৃন্দকে আদেশ দিয়াছেন। "একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব। একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥ ১।৯।৩২॥ অতএব আমি আজ্ঞা দিল সভাকারে। যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ যারে তারে॥ ১।৯।৩৪॥" প্রেম-ভাণ্ডারের মালিক শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাদিকে তাঁহার ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী করিয়া প্রেম-বিতরণের আদেশ করিলেন। এজন্যই তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে "ভক্তির ভাণ্ডারী" বলিলেন। ভাণ্ডার কোথায় থাকে? ভাণ্ডারে যে দ্রব্য থাকে, তাহার মালিকের গৃহেই ভাণ্ডার থাকে; ভাণ্ডারী সেই দ্রব্যের রক্ষকমাত্র; ভাণ্ডারীর গৃহে ভাণ্ডার থাকে না। মালিকের আদেশ পাইলেই ভাণ্ডারী ভাণ্ডারের দ্রব্য বাহির করিয়া দিতে পারেন, নিজের ইচ্ছামত পারেন না। যিনি মালিক, বাস্তবিক তিনিই দাতা। কাহাকেও ভাণ্ডারের দ্রব্য পাওয়াইবার নিমিত্ত যদি ভাণ্ডারীর ইচ্ছা হয়, তবে ভাণ্ডারী মালিকের নিকটে তাঁহার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার অভিলষিত ব্যক্তিকে দ্রব্য দেওয়ার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে পারেন। এতদতিরিক্ত ভাণ্ডারীর কোনও ক্ষমতা থাকেনা। তাই প্রভুর কথার উত্তরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন -"প্রভু, তুমিই সর্ব্বদাতা; আমি দাতা নই; আমি ভাণ্ডারীমাত্র; তুমি আদেশ করিলেই আমি দিতে পারি।" কিন্তু প্রভু তো পূর্ব্বেই আদেশ দিয়া রাখিয়াছেন—"অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ এ-দোঁহারে॥" তথাপি শ্রীঅদ্বৈত নিজে প্রেম দেওয়ার চেষ্টা না করিয়া বলিলেন—"কায়-মন-বচনে মোর এই কথা। এ-দুইর প্রেমভক্তি হউক সর্ব্বথা॥" ভঙ্গীতে তিনি জানাইলেন—"প্রেমভক্তি দানের বাস্তবিক অধিকার আমার নাই; রূপ-সনাতনের প্রেমভক্তি হউক, এই ইচ্ছামাত্র আমি করিতে পারি; ইহাতেই আমার অধিকার। প্রভু, কায়-মনোবাক্যে সেই ইচ্ছাই আমি তোমার চরণে নিবেদন করিতেছি।" প্রভুর আদেশ পাওয়া সত্ত্বেও শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন না—"আচ্ছা প্রভু, তুমি যখন আদেশ করিয়াছ, তখন আমি এই দুইজনকে প্রেমভক্তি দিলাম, বা দিতেছি।" ভক্তের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্যই হয়তো প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে বলিয়াছেন—"অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ এ-দোঁহায়।" ভক্তমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে প্রভু সর্ব্বদাই ব্যাকুল। কিন্তু "প্রেম পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে। কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে॥ ৩।৭।১২॥" কাহারও প্রেমপ্রাপ্তির জন্য ভক্তের ইচ্ছা কৃষ্ণ-শক্তিতেই অভিব্যক্ত হয়; তাহা না হইলে সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য কৃষ্ণ ব্যাকুল হন না। ভক্তের চিত্তে কৃষ্ণ-শক্তি সঞ্চারিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় যাঁহার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়, তাঁহার চিত্তে প্রেম আছে বলিয়া তিনিও মনে করেন না। তাঁহার অবস্থা শ্রীমন্ মহাপ্রভুই স্বীয় প্রলাপোক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। "দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ, সেহো মোর নাহি কৃষ্ণ পায়।" সুতরাং প্রেমের অধিকারী কৃষ্ণভক্তও কখনও কাহাকেও বলেন না—"আমি তোমাকে প্রেম দিব।" যে ভাগ্যবানের প্রতি তিনি প্রসন্ন হন, তাঁহার প্রেম-প্রাপ্তির অভিপ্রায়মাত্র তিনি প্রকাশ করিতে পারেন এবং তাঁহাকে প্রেমদান করার জন্য শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনাও জানাইতে পারেন। এইরূপ ইচ্ছা বা প্রার্থনাই সেই ভাগ্যবানের প্রতি কৃষ্ণভক্তের প্রসাদ (অনুগ্রহ)। শুদ্ধ-প্রেমিক ভক্তের এই ইচ্ছা বা প্রার্থনা ভক্তবৎসল ভগবান্ পূর্ণ করেন। সুতরাং মূল প্রেমদাতা হইলেন শ্রীকৃষ্ণ; কৃষ্ণ-ভক্তের প্রার্থনাতে প্রেমদানের ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণ-চিত্তে উদ্বুদ্ধ হয় মাত্র। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে ভক্তের অনুগ্রহ-পাত্র ভাগ্যবান্ জীবের চিত্ত-বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে প্রেমদান করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণভক্তের এইরূপ অনুগ্রহ-জনিত কৃষ্ণরতিকেও "বিরলোদয়" বলার হেতু বোধ হয় এইরূপ। শুদ্ধ-প্রেমবান্ কৃষ্ণভক্তই জগতে অতি বিরল। "কোটিজ্ঞানি মধ্যে হয় একজন মুক্ত। কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥ ২।১৯।১৩১॥ মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ শ্রীভা, ৬।১৪।৫॥"

আর, সাধনাভিনিবেশ হইতে যে কৃষ্ণরতি লাভ হয়, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ হইতেই। সাধনাভিনিবেশ বশতঃ চিত্ত শুদ্ধ হয়; শুদ্ধ চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়; এই প্রেমও আসে প্রেমের মূল ভাণ্ডারস্বরূপ এবং প্রেমের একমাত্র অধিকারী ও দাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতেই। শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ প্রেম দিতে পারেন না।

রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ-স্ফুরণ।
উদ্বেগ-বিষাদ-দৈন্যে করে প্রলপন ॥ ৩০

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৩২৮)—
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে। ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যুগায়িতমিতি। হে সখি বিশাখে! গোবিন্দবিরহেণ হেতুভুতেন মে মম নিমেষেণ ক্রুটিলবকালেন যুগায়িতং তদ্বদাচরিতং চক্ষুষা নেত্রদ্বয়েন প্রাবৃষায়িতং বর্ষাকালীয়মেঘবদাচরিতং সর্ব্বং জগৎ শূন্যায়িতং তদ্বদাচরতি স্ম। অতএব মৎপ্রাণনাথং দর্শয়িত্বা প্রাণং রক্ষ ইতি ভাবঃ। শ্লোকমালা। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতে কেহ প্রেম পায় না, শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও প্রেম দেন না—এই উক্তি বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না।

যাঁহারা উক্তরূপ কথা বলেন, তাঁহারা যে পদ্মের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন, সেই দৃষ্টান্তই তাঁহাদের উক্তির অসারতা খ্যাপন করিয়া থাকে। পদ্ম কেবল মধুকরকেই মধু দেয়, অপর কোনও জীবকেই দেয় না। তাহার কারণ এই যে—মধু আহরণের সামর্থ্য মধুকরেরই আছে, অপর কাহারও নাই। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণরূপ পদ্ম হইতে মধু গ্রহণের সামর্থ্য কেবলমাত্র ভক্তরূপ মধুকরেরই আছে, অপর কাহারও নাই। ভক্তই শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজের মধুপ। ভক্তও জীবই; শ্রীকৃষ্ণ যদি কাহাকেও প্রেম না দেন, তবে ভক্ত তাহা কোথা হইতে পাইয়া থাকেন? কোনও জীবস্বরূপেই হ্লাদিনী শক্তি নাই; সুতরাং কোনও জীবস্বরূপই শ্রীকৃষ্ণকৃপাব্যতীত আপনা-আপনিই প্রেমের অধিকারী হইতে পারেন না এবং শ্রীকৃষ্ণশক্তিব্যতীত অপর কাহাকেও প্রেম দিতেও পারেন না। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণশক্তি ধারণ করেন। তাই ভক্তের ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও প্রেম দিতে পারেন।

৩০। প্রেমধনের কথা বলিতে বলিতেই হঠাৎ প্রভুর উদ্‌ঘূর্ণার ভাব ছুটিয়া গেল, ভক্তভাব অন্তর্হিত হইল; আবার প্রভু কৃষ্ণ-বিরহকাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইলেন; এই বিরহের ভাব স্ফুরিত হওয়ায় প্রভুর চিত্তে উদ্বেগ, বিষাদ, দৈন্যাদি-ভাবের উদয় হইল; এই সমস্ত ভাবের উদয়ে প্রভু "যুগায়িতং নিমেষেণ" ইত্যাদি শ্লোক পড়িয়া প্রলাপ করিতে লাগিলেন। এই "যুগায়িতং নিমেষেণ" শ্লোকটীও প্রভুর স্বরচিত; ইহা শিক্ষাষ্টকের সপ্তম শ্লোক। **রসান্তরাবেশে**—অন্যরসের আবেশে; মধুর-রসের আবেশে। **বিয়োগ-স্ফুরণ**—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের স্ফুরণ। **উদ্বেগ বিষাদ**—৩।১৭।৪৬ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **প্রলপন**—প্রলাপ।

শ্লো। ৯। অন্বয়। গোবিন্দবিরহেণ (গোবিন্দবিরহে) মে (আমার) নিমেষেণ (নিমেষকাল) যুগায়িতং (এক যুগের মতন দীর্ঘ হইয়াছে), চক্ষুষা (চক্ষু) প্রাবৃষায়িতং (বর্ষার মতন হইয়াছে), সর্ব্বং জগৎ (সমস্ত জগৎ) শূন্যায়তে (শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে)।

অনুবাদ। শ্রীরাধা বলিলেন—গোবিন্দ-বিরহে আমার এক নিমেষকাল এক যুগের মতন দীর্ঘ হইয়াছে, আমার চক্ষু বর্ষার মতন হইয়াছে (সর্ব্বদা প্রবলবেগে নয়নধারা পড়িতেছে), সমস্ত জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। ৯

কৃষ্ণবিরহকাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজেকে শ্রীরাধা এবং রায় রামানন্দকে বিশাখা মনে করিয়া বলিলেন—"সখি বিশাখে! শ্রীকৃষ্ণবিরহে এক নিমেষ-পরিমিত সময়ও যেন আমার নিকটে এক যুগ বলিয়া মনে হইতেছে—দুঃখের সময় যে আর কাটেনা সখি! কতকাল আর আমি এই অসহ্য বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিব? আর দেখ সখি, আমার নয়ন হইতে যেন বর্ষার ধারা প্রবাহিত হইতেছে—তথাপি সখি! বিরহানল তো নির্ব্বাপিত হইতেছে না; আর কতকাল সখি! প্রাণবল্লভের বিরহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইব? সখি! প্রাণবল্লভের অভাবে সমস্ত জগৎ যেন আমি শূন্য দেখিতেছি। এভাবে কিরূপে প্রাণধারণ করিব সখি! শীঘ্র আমার প্রাণনাথকে দেখাইয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর সখি!"

উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ হৈল যুগসম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন ॥ ৩১
গোবিন্দবিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥ ৩২
কৃষ্ণ উদাসীন হৈল করিতে পরীক্ষণ।
সখীসব কহে—কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ ॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ক্ষণ-কল্পতার উদাহরণ।

৩১। এক্ষণে "যুগায়িতং" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

উদ্বেগে—প্রাণের অস্থিরতায়। **ক্ষণ**—ক্ষণমাত্র সময়, অতি অল্প সময়। **যুগসম**—একযুগের তুল্য দীর্ঘ। **উদ্বেগে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত উদ্বেগে সময় যেন আর যায় না; অতি অল্প সময়কেও এক যুগের ন্যায় দীর্ঘ মনে হইতেছে। ইহা "যুগায়িতং নিমেষেণ" অংশের অর্থ।

বর্ষার মেঘ প্রায় ইত্যাদি—নয়ন বর্ষার মেঘের ন্যায় অশ্রু-বর্ষণ করিতেছে; বর্ষার ধারার ন্যায় নয়ন হইতে অবিরত অশ্রু বর্ষিত হইতেছে। ইহা "চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং" অংশের অর্থ।

৩২। **গোবিন্দ-বিরহে**—আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আনন্দদাতা (গোবিন্দ) শ্রীকৃষ্ণের বিরহে।

শূন্য হৈল ত্রিভুবন—ত্রিভুবনকেই শূন্য বলিয়া মনে হইতেছে। কোথাও এমন কোন জনপ্রাণী আছে বলিয়া মনে হয় না, যাহার সঙ্গে দু'টি কথা বলিয়া শান্তি পাইতে পারি। কৃষ্ণ না থাকায় মনে হইতেছে যেন কোথায়ও কেহ নাই—সব শূন্য, প্রাণ শূন্য, মন শূন্য, ত্রিজগৎ শূন্য—প্রাণ কেবল হাহাকার করিতেছে।

এই পয়ারার্দ্ধ "শূন্যায়িতং" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের অর্থ।

তুষানলে—তুষের আগুনে। তুষের আগুনের শিখা থাকেনা, জ্বলন্ত অঙ্গার থাকেনা—দেখিলে আগুন আছে বলিয়া মনে হয় না; অথচ তীব্র তাপ—তীব্র জ্বালা; তুষের আগুনে যাহা ডুবাইয়া রাখা যায়, তাহা পুড়িয়া ভস্মীভুত হইয়া যায়। উপরে ছাই থাকে, ভিতরে তীব্র তাপ। প্রিয়-বিরহ-জ্বালাও এইরূপ—বাহিরে বেশী কিছু দেখা যায় না, ভিতরে হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়।

তুষানলে ইত্যাদি—কৃষ্ণবিরহের আগুন তুষানলের ন্যায় আমার হৃদয়ে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে, তাতে আমার দেহ, মন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে; কিন্তু সখি! তথাপি প্রাণ যাইতেছে না; প্রাণ যদি বাহির হইয়া যাইত, তাহা হইলেও এই অসহ্য জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিতাম।

"যেন" স্থলে "মন" বা "দেহ" পাঠান্তর আছে।

৩৩। এক সময়ে শ্রীরাধার প্রেম পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইতে লাগিলেন—শ্রীরাধার নিকটেও আসেন না, শ্রীরাধার কোনও সখী তাঁহার নিকটে শ্রীরাধার বিরহ-কাতরতার কথা জ্ঞাপন করিলেও তাহা শুনিয়া যে শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত হইয়াছেন, এমন কোনও ভাবও দেখান না, শ্রীরাধার সখীদের নিকটে শ্রীরাধার কোনও সংবাদও জিজ্ঞাসা করেন না, শ্রীরাধার বিরহে নিজেও যে খুব কাতর হইয়াছেন, এমন কোনও লক্ষণও প্রকাশ করেন না। এদিকে শ্রীরাধা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে অত্যন্ত অধীরা হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার সান্ত্বনা বিধানের উদ্দেশ্যে সখীগণ তাঁহাকে বলিলেন—"রাধে! শ্রীকৃষ্ণ যেমন তোমার প্রতি উদাসীন হইয়াছেন, তুমিও তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাও—শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত কোনওরূপ কাতরতা প্রকাশ করিও না, তাঁহার নিকটে কোনও দূতীকেও পাঠাইও না, শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি উদাসীন হইয়াছেন বলিয়া তোমার যেন কিছুই হয় নাই, এমন ভাব প্রকাশ কর। এইরূপ করিলেই দেখিবে—কৃষ্ণ আর না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না।" সখীগণের এইরূপ উপদেশের কথা চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরাধার চিত্তে প্রেমের সঞ্চারি-ভাবসমূহ উদিত হইল—ঈর্ষ্যা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, বিনয় ইত্যাদি ভাবসমূহ যেন একই সময়ে তাঁহার চিত্তে আসিয়া উপস্থিত হইল; এই সমস্ত ভাবের আবেশে শ্রীরাধার মন অস্থির হইয়া পড়িল;

এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয়॥ ৩৪
ঈর্ষ্যা উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়।
এত ভাব একঠাঞি করিল উদয়॥ ৩৫
এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল।
সখীগণ-আগে প্রৌঢ়ি-শ্লোক যে পঢ়িল॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এইরূপ অবস্থায় তিনি সখীদিগের নিকটে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" ইত্যাদি শ্লোকে সে সমস্ত বিবৃত হইয়াছে। একদিন রাধাভাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুও কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া মনে করিলেন, তাঁহার সখীগণও যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের নিমিত্তই তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। এই কথা মনে হইতেই শ্রীরাধার পূর্ব্বোক্ত ভাবদ্যোতক "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোকটী প্রভুর মনে পড়িল—মনে পড়িতেই প্রভু সেই শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন এবং উচ্চারণ করিতে করিতেই প্রভুর চিত্তে শ্রীরাধার পূর্ব্বোক্ত ভাবের স্ফুরণ হইল, প্রভু শ্লোকটীর অর্থ করিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণ উদাসীন হৈল" ইত্যাদি পাঁচ পয়ারে উল্লিখিত বিষয়টী ব্যক্ত করিয়া "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোকটীর অবতারণা করা হইয়াছে।

কৃষ্ণ উদাসীন হৈল—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি ঔদাসীন্য (নির্লিপ্ততা) দেখাইতে লাগিলেন।

করিতে পরীক্ষণ—শ্রীরাধার প্রেম পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত। শ্রীরাধার প্রেম পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইতে লাগিলেন।

সখীসব কহে—কৃষ্ণের ঔদাসীন্যে শ্রীরাধার কাতরতা দেখিয়া শ্রীরাধার সখীগণ শ্রীরাধাকে বলিলেন।

কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ—রাধে! কৃষ্ণের প্রতি উপেক্ষা (ঔদাসীন্য) প্রদর্শন কর।

৩৪। **এতেক চিন্তিতে**—সখীগণের উপদেশের কথা (শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করার উপদেশ) চিন্তা করিতে করিতে। **নির্ম্মল হৃদয়**—যে হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত আর কিছুই নাই। **স্বাভাবিক প্রেমা**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার স্বভাব-সিদ্ধ (নিত্যসিদ্ধ) প্রেম। **স্বভাব**—প্রকৃতি, স্বরূপগত ধর্ম্ম।

সখীগণের উপদেশ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরাধার নির্ম্মল হৃদয় স্বভাবসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপগতধর্ম্ম প্রকাশ করিল—শ্রীরাধার হৃদয়ে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চারি-ভাব-আদির উদয় হইল। প্রেমের উচ্ছ্বাসে হৃদয় যখন উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তখন স্বভাবতঃই সঞ্চারি-ভাব-আদি প্রকটিত হয়; শ্রীরাধার চিত্তেও তাহাই হইল।

৩৫। প্রেমের উচ্ছ্বাসে শ্রীরাধার হৃদয়ে কি কি ভাবের উদয় হইল, তাহা বলিতেছেন।

ঈর্ষ্যা—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইয়া হয়তো অন্য রমণীর সঙ্গ করিতেছেন, ইত্যাদি ভাবিয়া ঈর্ষ্যার উদয় হইল।

উৎকণ্ঠা—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা। "শ্রীকৃষ্ণ অন্য রমণীর সঙ্গ করিলেও তিনি আমারই প্রাণনাথ" ইত্যাদি ভাবিয়া তাঁহার সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধা উৎকণ্ঠিত হইলেন।

দৈন্য—তাঁহারই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন ভাবিয়া শ্রীরাধার চিত্তে দৈন্যের উদয় হইল।

প্রৌঢ়ি—অধ্যবসায়; প্রগল্‌ভতা (শব্দকল্পদ্রুম)।

প্রৌঢ়ি বিনয়—প্রগল্‌ভতাময় বিনয়; শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা প্রগল্‌ভার ন্যায় বিনয়-বাক্য বলিতে লাগিলেন, যেন তিনি ফিরিয়া আসেন; অনর্গল বহুবিধ বিনয়-বাক্য বলিতে লাগিলেন। অথবা অধ্যবসায়ময় বিনয়; শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা পুনঃ পুনঃ বিনয়-বাক্য বলিতে লাগিলেন, যেন তিনি ফিরিয়া আসেন।

একঠাঞি—একই স্থানে; যুগপৎ। ঈর্ষ্যাদি সমস্ত ভাবই একই সময়ে শ্রীরাধার চিত্তে উদিত হইল।

৩৬। **এত ভাবে**—ঈর্ষ্যা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, বিনয়াদি ভাবে। **সখীগণ আগে**—সখীগণের সাক্ষাতে,

সেইভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইল॥ ৩৭

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৩৪১)—
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ ১০॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

আশ্লিষ্যেতি। হে সখি বিশাখে! স প্রাণনাথঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পাদরতাং পাদদাসিকাং মাং আশ্লিষ্য আলিঙ্গ্য পিনষ্টু আত্মসাৎ করোতু বা, অদর্শনাৎ মর্ম্মহতাং মৃত্যুতুল্য-পীড়িতাং করোতু বা, লম্পটঃ বহুবল্লভঃ স যথা তথা মাং হিত্বা অন্যাভিঃ বল্লভাভিঃ সহ বিহারং বিদধাতু করোতু বা, তু তথাপি স এব শ্রীকৃষ্ণ এব মৎ মম প্রাণনাথঃ ন অপরঃ। শ্লোকমালা। ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহাদের উপদেশের উত্তরে। **প্রৌঢ়ি শ্লোক**—প্রগল্‌ভতাময় শ্লোক; যে শ্লোকে শ্রীরাধার প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পাইয়াছে। **প্রগল্‌ভতা**—নিঃসঙ্কোচে মনের সমস্ত কথা প্রকাশ।

ঈর্ষ্যাদি নানা ভাব যুগপৎ শ্রীরাধার মনে উদিত হওয়ায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, তাঁহার ধৈর্য্য নষ্ট হইল, তিনি প্রগল্‌ভার ন্যায় নিঃসঙ্কোচে সখীগণের নিকটে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন।

"প্রৌঢ়ি-শ্লোক"-শব্দে নিম্নোদ্ধৃত "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোকের কথাই বলা হইয়াছে। এই শ্লোকেই শ্রীরাধা নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই শ্লোকটীও শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর স্বরচিত; ইহা শিক্ষাষ্টকের অষ্টম বা শেষ শ্লোক। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মুখে শ্রীরাধার উক্ত শ্লোকটী স্ফুরিত হইয়াছিল--তৎপূর্ব্বে এই শ্লোকটী কেহ জানিত না বলিয়াই বোধহয় এই শ্লোকটী মহাপ্রভুর রচিত বলিয়া প্রকাশ। অথবা, শ্রীরাধার মুখেই যখন এই শ্লোকটীর সর্ব্বপ্রথম স্ফুরণ, তখন এই শ্লোকটীকে শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর রচিত বলিলে কোনও দোষ হয় না।

৩৭। **সেই ভাবে**—শ্রীরাধা যে ভাবে শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই ভাবে; প্রগল্‌ভতার সহিত। শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্‌মহাপ্রভু মনে করিলেন যেন তাঁহার সখীগণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের নিমিত্তই তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন; তখন, শ্রীরাধা যেরূপে সখীগণের উপদেশের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন, প্রভুও সেইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরাধার উক্ত "আশ্লিষ্য" ইত্যাদি শ্লোকটী প্রগল্‌ভতার সহিত উচ্চারণ করিলেন।

সেই শ্লোক—শ্রীরাধার উক্ত "আশ্লিষ্য" ইত্যাদি শ্লোক। **উচ্চারিল**—প্রভু উচ্চারণ করিলেন, বলিলেন। **তদ্রূপ আপনে হইল**—শ্লোক-উচ্চারণ করা মাত্রেই প্রভুও ঈর্ষ্যাদি-ভাবাকুলচিত্তা শ্রীরাধার ভাবে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট হইলেন। **আপনে**—প্রভু নিজে।

শ্লো। ১০। অন্বয়। সঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণ) পাদরতাং মাং (পদদাসী আমাকে) আশ্লিষ্য (আলিঙ্গন করিয়া) পিনষ্টু (বক্ষঃস্থলে নিষ্পেষিতই করুন) বা (অথবা) অদর্শনাৎ (দর্শন না দিয়া) মর্ম্মাহতাং (আমাকে মর্ম্মাহতই) করোতু (করুন), বা (অথবা) সঃ (সেই) লম্পটঃ (বহুবল্লভ) যথা তথা (যেখানে সেখানে) বিদধাতু (বিহারই করুন), তু (তথাপি) স এব (তিনিই) মৎপ্রাণনাথঃ (আমার প্রাণনাথ) ন অপরঃ (অপর কেহ নহেন)।

অনুবাদ। শ্রীরাধা কহিলেন—হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদদাসী আমাকে আলিঙ্গনদ্বারা বক্ষঃস্থলে নিষ্পেষিত (আত্মসাৎ) ই করুন, অথবা দর্শন না দিয়া আমাকে মর্ম্মাহতই করুন, অথবা সেই বহুবল্লভ যেখানে সেখানে (যে কোনও অন্য রমণীর সহিত) বিহারই করুন, তিনি যাহাই করুন না কেন, তিনি আমার প্রাণনাথই, প্রাণনাথ-ব্যতীত অপর কেহ নহেন। ১০

এই শ্লোকের হয় অতি অর্থের বিস্তার।
সংক্ষেপে করিয়ে, তার নাহি পাই পার ॥ ৩৮

যথারাগঃ—
আমি কৃষ্ণপদদাসী,　　তেঁহো রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন,　　জারেন আমার তনুমন,
তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৮। **এই শ্লোকের**—"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোকের।

অতি অর্থের বিস্তার—শ্লোকটীর সম্যক্ অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত।

তার নাহি পাই আর—শ্লোকটীর অর্থের (তার) পার পাই না। শ্লোকটীর সম্পূর্ণ বিস্তৃত অর্থ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার (গ্রন্থকারের) নাই।

গ্রন্থকার দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া এই শ্লোকটীর যে বিস্তৃত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, সম্যক্‌রূপে তাহা বিবৃত করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই; তাই তিনি অতি সংক্ষেপে (আমি কৃষ্ণপদ-দাসী ইত্যাদি ত্রীপদী সমূহে) তাহা জানাইতেছেন।

কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে এই পয়ারটী দেখিতে পাওয়া যায় না। মূলগ্রন্থে যদি এই পয়ারটী না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, "আমি কৃষ্ণপদদাসী" ইত্যাদি ত্রিপদীতে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহাই প্রভুকৃত শ্লোকব্যাখ্যা। আর এই পয়ারটী থাকিলে বুঝিতে হইবে, "আমি কৃষ্ণপদ-দাসী" ইত্যাদি ত্রিপদীতে প্রভুকৃত ব্যাখ্যার দিগ্‌দর্শন মাত্র দেওয়া হইয়াছে।

৩৯। এক্ষণে "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোকের অর্থ করা হইতেছে।

আমি কৃষ্ণপদ-দাসী—শ্রীরাধার ভাবাবিষ্ট প্রভু বলিতেছেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণ-চরণের দাসী; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যখন যাহাই করুন না কেন, সেবাদ্বারা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সুখ-বিধানই আমার কর্ত্তব্য।" **তেঁহো**—তিনি, শ্রীকৃষ্ণ।

রস-সুখ-রাশি—রসের রাশি ও সুখের রাশি; রসসমূহ ও সুখসমূহ। **রসরাশি**—শ্রীকৃষ্ণ রস-স্বরূপ—"রসো বৈ সঃ"; তাই শৃঙ্গারাদি সমস্ত রসই তিনি। রস-স্বরূপে তিনি আস্বাদ্য; আবার রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ অর্থে, তিনি রসের আস্বাদক, রসিক; রস-আস্বাদকের যত রকম বৈচিত্রী আছে, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত, তিনি রসিক-শেখর। **সুখরাশি**—শ্রীকৃষ্ণ সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ; তিনি আনন্দঘনবিগ্রহ, মূর্ত্তিমান্ আনন্দ; তাঁহার দেহ ঘনীভূত আনন্দদ্বারা গঠিত; অনন্দ ব্যতীত তাঁহাতে আর কিছুই নাই।

আলিঙ্গিয়া—আমাকে (শ্রীরাধাকে) আলিঙ্গন করিয়া। **করে আত্মসাথ**—অঙ্গীকার করেন; দৃঢ় আলিঙ্গনের দ্বারা তাঁহার দেহের সঙ্গে আমার দেহকে নিষ্পেষিত করেন। ইহা শ্লোকস্থ "আশ্লিষ্য" শব্দের অর্থ।

কিবা—আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাথই করুন, অথবা। **না দেন দরশন**—দর্শন না দেন, আলিঙ্গন করা তো দূরে থাকুক, যদি তিনি আমার সাক্ষাতেও না আসেন। **জারেন**—দুঃখে জর্জ্জরিত করেন (দর্শন না দিয়া)। "জারেন আমার তনুমন" স্থলে "জ্বালেন আমার মন" এরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। জালেন—জালাইয়া দেন, দগ্ধ করেন। **আমার তনুমন**—আমার (শ্রীরাধার) তনু (দেহ) ও মনকে (দুঃখে জর্জ্জরিত করেন)।

"কিবা না দেন দরশন" ইত্যাদি শ্লোকস্থ "অদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা" অংশের অর্থ।

তভু—দর্শন না দিয়া আমার দেহ-মনকে দুঃখে জর্জ্জরিত করিলেও। **তেঁহো মোর প্রাণনাথ**—তথাপি সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণবল্লভই; তথাপি তিনি আমার আপন জনই, তিনি আমার অপর নহেন। ইহা শ্লোকস্থ "মৎ-প্রাণনাথস্তু স এব" অংশের অর্থ।

"আমি কৃষ্ণপদ-দাসী" হইতে "মোর প্রাণ-নাথ" পর্য্যন্ত :—শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রায় রামানন্দাদিকে স্বীয় সখী মনে করিয়া বলিতেছেন—"সখি! কৃষ্ণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের নিমিত্ত তোমরা আমাকে উপদেশ

সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয়॥ ধ্রু॥ ৪০

ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু-মন
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা-সভারে দেন পীড়া, আমাসনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দিতেছ; কিন্তু সখি! আমি কিরূপে তাঁহার প্রতি উপেক্ষা দেখাইব? আমি যে তাঁর চরণ-সেবার দাসী; সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার সেবা করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে সুখী করার চেষ্টা করাই যে আমার কর্ত্তব্য; আমার প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য দেখিয়া আমি কিরূপে তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারি? সখি! আমার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া যদি তিনি আনন্দ পায়েন, তবে আমারও তাতেই সুখ—তাঁর সুখ-বিধানই যে আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। সখি! শ্রীকৃষ্ণতো রস-স্বরূপ, তিনি যে আনন্দস্বরূপ। তিনি যাহাই করুন না কেন, তাতেই কেবল আনন্দ এবং রসের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে; সেই ধারায় সকলকেই পরিপ্লুত করিয়া দেয় সখি। তিনি রসিক-শেখর; রস এবং আনন্দ আস্বাদনই তাঁর কার্য্য; রস এবং আনন্দ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে—তাঁহার রসাস্বাদনের বৈচিত্রী-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তিনি যখন যে কার্য্যই করুন না কেন, সেই কার্য্যের আনুকূল্য বিধান করিয়া তাঁহাকে সুখী করার চেষ্টা করাই তাঁর দাসীর কর্ত্তব্য—তাহাতেই তাঁর দাসীর আনন্দ, তাহাতেই তার তৃপ্তি; সেই মূর্ত্তিমান্ আনন্দ শ্রীকৃষ্ণের যে কোনও কার্য্যের আনুকূল্য বিধান করিতে পারিলেই তাঁহার দাসীর আনন্দ। সখি! তিনি আমার প্রাণবল্লভ, আর আমি তাঁহার দাসী। তিনি যদি তাঁহার এই দাসীকে দৃঢ় আলিঙ্গনের দ্বারা তাঁহার সুবিশাল বক্ষঃস্থলে নিষ্পেষিত করিয়া আনন্দ পায়েন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থা; আর তাহা না করিয়া, আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদি দূরে সরিয়া যায়েন—একবারও যদি আমার চক্ষুর সাক্ষাতে না আসেন এবং তাতেই যদি তিনি সুখ পায়েন, তাহাতে তাঁহার অদর্শন-দুঃখে আমার দেহ-মন জর্জ্জরিত হইলেও তিনি আমার প্রাণবল্লভই; তখনও তাঁহাকে আমার দুঃখদাতা বলিয়া আমি মনে করিতে পারি না; তাঁর সুখই যে তাঁর এই দাসীর একমাত্র লক্ষ্য সখি! আমার সুখ তো আমি চাই না সখি!”

এস্থলে মতি-ভাব সূচিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

৪০। **সখি হে**—রাধাভাবে রায়রামানন্দাদিকে স্বীয় সখী মনে করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন “সখি হে!”

মনের নিশ্চয়—আমার মনের নিশ্চিত ধারণা। **অনুরাগ করে**—আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি প্রকাশ করেন। **দুঃখ দিয়া মারে**—তাঁহার অদর্শন-দুঃখ দিয়া আমাকে প্রাণান্তক যাতনা দেন। **প্রাণেশ**—প্রাণনাথ। **অন্য নয়**—শ্রীকৃষ্ণ আমার “পর” নহেন। “মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ” অংশের অর্থ।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেনঃ—“সখি! আমার মনের যে নিশ্চিত ধারণা—যাহা আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করি, তাহা বলি শুন। শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গনাদি দ্বারা আমার প্রতি প্রীতিই প্রকাশ করুন, কিম্বা, আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইয়া মরণান্তক দুঃখই দান করুন—তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন না কেন, সকল অবস্থাতেই তিনি আমার প্রাণবল্লভ, আমার নিতান্ত আপনার লোক, তিনি কোনও সময়েই আমার পর নহেন। যখন তিনি আমার নিকটে থাকিবেন, তখনই যে তিনি আমার বন্ধু, নিতান্ত আপন-জন হইবেন—আর যখন আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, তখনই যে তিনি আমার পর হইবেন, তা নয় সখি! সকল সময়েই তিনি আমার প্রাণবল্লভ, আপনজন।”

৪১। তাঁহার মনের ভাব আরও বিশেষরূপে প্রকাশ করিতেছেন।

ছাড়ি অন্য নারীগণ—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্য প্রেয়সীগণকে ত্যাগ করিয়া।

মোর বশ তনু-মন—তাঁর তনু-মনকে আমার বশীভূত করিয়া; আমার ইচ্ছানুসারে তাঁহার তনু (দেহ) এবং মন দ্বারা আমার প্রীতিবিধান করিয়া। সর্ব্বতোভাবে আমার প্রীতিবিধানের বাসনা মনে রাখিয়া (তাঁহার মনকে

কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট,
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আমার বশে রাখিয়া) এবং তাঁহার দেহদ্বারা আমার অভিপ্রায়ানুরূপ ক্রীড়াদি করিয়া (তাঁহার দেহকে আমার বশে রাখিয়া)।

মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া—তাঁহার সঙ্গলাভরূপ সৌভাগ্য আমাকে দান করিয়া। **তা-সভারে**—তাঁহার অন্য প্রেয়সীগণকে। **দেন পীড়া**—মনঃকষ্ট দেন। তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাতেই শ্রীরাধার সঙ্গে ক্রীড়া করায় তাঁহাদের মনঃকষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। **সেই নারীগণে দেখাইয়া**—তাঁহার পরিত্যক্তা প্রেয়সীগণের চক্ষুর সাক্ষাতেই।

পূর্ব্ব ত্রিপদীতে উক্ত "কিবা করে অনুরাগ"—এই বাক্যের উদাহরণ দিলেন, এই ত্রিপদীতে।

৪২। **কিবা**—অথবা। অন্য প্রেয়সীগণের চক্ষুর সাক্ষাতে আমার সঙ্গেই ক্রীড়া করেন, কিম্বা।

তেঁহো লম্পট—সেই লম্পট শ্রীকৃষ্ণ। যে বহু রমণী সম্ভোগ করে, তাহাকে লম্পট বলে।

শঠ—যে সম্মুখে প্রিয়বাক্য বলে, কিন্তু পরোক্ষে অপ্রিয় কার্য্য করে, এবং নিগূঢ় অপরাধ করে, তাহাকে শঠ বলে। "প্রিয়ং ব্যক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশং। নিগূঢ়মপরাধঞ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ॥—উঃ নীঃ নাঃ ২৯।"

ধৃষ্ট—অন্য যুবতীর ভোগচিহ্ন সকল স্বীয় দেহে স্পষ্ট ভাবে দৃষ্ট হইলেও, যে নায়ক স্বীয় প্রেয়সীর সাক্ষাতে নির্ভয়তার সহিত মিথ্যাবচনে দক্ষতা প্রকাশ করিয়া দোষ ক্ষালন করিতে প্রয়াস পায়, তাহাকে ধৃষ্ট বলে। "অভিব্যক্তান্যতরুণী-ভোগলক্ষ্মাপি নির্ভয়ঃ। মিথ্যাবচনদক্ষশ্চ ধৃষ্টোঽয়ং খলু কথ্যতে॥—উঃ নীঃ নাঃ ৩১।"

সকপট—কপটতার সহিত বর্ত্তমান; কপট। যাহার মুখে এক রকম কথা, মনে আর এক রকম ভাব, তাহাকে কপট বলে। **অন্য নারীগণ করি সাথ**—অন্য রমণীগণকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া। **মোরে দিতে মনঃপীড়া**—আমার মনে দুঃখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

মোর আগে করে ক্রীড়া—আমার সাক্ষাতেই সেই সকল রমণীর সঙ্গে ক্রীড়া করেন।

এই ত্রিপদীতে পূর্ব্বোক্ত "কিবা দুঃখ দিয়া মারে" বাক্যের উদাহরণ দিতেছেন।

"ছাড়ি অন্য নারীগণ" হইতে "মোর প্রাণনাথ" পর্য্যন্ত:—শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে তাঁহার প্রতি অনুরাগ দেখাইতে পারেন এবং কিরূপেই বা দুঃখ দিয়া তাঁহাকে মারিতে পারেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন। "সখি! বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অনেক প্রেয়সীই আছেন, তাহা তোমরা জানই। কিন্তু অন্য সকল প্রেয়সীর প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া, তাঁহাদের সাক্ষাতে, তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দেখাইয়াই যদি তিনি আমার সঙ্গে ক্রীড়া করেন—সর্ব্বতোভাবে আমার প্রীতিবিধানের বাসনাই মনে পোষণ করেন এবং আলিঙ্গন-চুম্বনাদি দ্বারা দেহেও সর্ব্বতোভাবে আমারই অভীষ্ট সিদ্ধ করেন—এই ভাবে তিনি আমার সৌভাগ্যাতিশয় প্রকট করিলেও তিনি আমার যেমনি প্রাণবল্লভ—আমার প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া, আমার প্রতি শঠতা, ধৃষ্টতা, কপটতা দেখাইয়া, যদি আমারই সাক্ষাতে, আমাকে দেখাইয়া দেখাইয়াই তিনি তাঁহার অন্য প্রেয়সীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া আমার মনে দুঃখ দিতে চেষ্টা করেন—তাহা হইলেও তিনি আমার তেমনি প্রাণবল্লভই; তাহাতে আমার প্রাণের উপরে, আমার প্রীতির উপরে তাঁহার দাবী একটুও কমিবে না। সখি! আমি জানি, তিনি লম্পট—বহু রমণীতে আসক্ত, আমি জানি, তিনি শঠ—আমার সাক্ষাতে আমাকেই তাঁহার জীবাতু বলিয়া প্রকাশ করেন, কিন্তু আমার অসাক্ষাতে অন্য রমণীতেই প্রাণ মন অর্পণ করেন; আমি জানি, তিনি ধৃষ্ট—অন্য রমণীর কুঞ্জে নিশাযাপন করিয়া, তাহার চরণের অলক্তক-চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া নিশিশেষে আমার কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং মিথ্যা কথায় দক্ষতা প্রকাশ করিয়া ঐ অলক্তক-চিহ্নকে গৈরিক-

না গণি আপন দুখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥ ৪৩

যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাঞা কাহে হয় দুখী ?।
মুঞি তার পায়ে পড়ি, লঞা যাঙ্ হাথে ধরি,
ক্রীড়া করাঞা করোঁ তাঁরে সুখী ॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাগ বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা করেন ; সমস্তই জানি সখি ! কিন্তু তথাপি আমার দেহ-মন-প্রাণ সমস্তই তাঁহার চরণে অর্পণ না করিয়া থাকিতে পারি না সখি ! তিনি যে আমার প্রাণবল্লভ সখি !”

এ স্থলে, লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট ইত্যাদি শব্দে ঈর্ষ্যাভাব সূচিত হইতেছে।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে ভাববন্ধন আছে, ধ্বংসের কারণ সত্ত্বেও তাহা ধ্বংস হয় না, ইহাই “মোরে দিতে মনঃপীড়া” ইত্যাদি ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে। ইহাই প্রেমের লক্ষণ। “সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যুনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ৪৬।”

৪৩। শ্রীকৃষ্ণ যখন দুঃখ দেন, তখনও কেন তাঁহাকে প্রাণবল্লভ বলিতেছেন, তাহার হেতু দেখাইতেছেন।

না গণি আপন দুঃখ—নিজের দুঃখের কথা আমি ভাবি না। নিজের সুখ বা দুঃখাভাব আমার অনুসন্ধানের বিষয় নহে। **সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ**—আমি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের (তাঁর) সুখই বাঞ্ছা করি। **তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য**—তাঁর সুখ-বিধানই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার যত কিছু চেষ্টা, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত ; আমার এই দেহও তাঁহার সুখের নিমিত্তই।

মোরে যদি ইত্যাদি—আমাকে দুঃখ দিলে যদি তাঁর অত্যন্ত সুখ হয়, তবে তাঁহার প্রদত্ত সেই দুঃখই আমার পক্ষে পরমসুখ—কারণ, তাতে তিনি সুখী হয়েন ; তাঁর সুখেই আমার সুখ। **সুখবর্য্য**—সুখশ্রেষ্ঠ, পরমসুখ।

“সখি ! তিনি যখন আমাকে দুঃখ দেন, তখনও তিনি আমার প্রাণবল্লভ কেন, বলি শুন। আমি তো কখনই আমার নিজের সুখ চাইনা সখি ! আমি কখনও এমন আশা করি নাই যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সুখী করুন, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দুঃখ না দেন। আমি চাই কেবল তাঁর সুখ—আমার দেহ, মন, প্রাণ,—আমার সমস্ত চেষ্টা—একমাত্র তাঁর সুখ-বিধানের নিমিত্তই উৎসর্গীকৃত। আমাকে দুঃখ দিলে যদি তিনি সুখী হয়েন, তবে তিনি আমাকে দুঃখ দিউন, ইহাই আমি চাই ; আমার দুঃখ যদি তাঁহার সুখের হেতু হয়, তবে সেই দুঃখ আমার দুঃখ নয়, পরমসুখ বলিয়াই সেই দুঃখকে আমি অম্লানবদনে বরণ করিয়া লইব সখি ! তাঁর সুখই যখন আমার প্রাণের সাধ, তখন তাঁহার সুখের হেতুভূত দুঃখ যখন তিনি আমাকে দেন, তখন তিনি আমার প্রাণের কামনাই পূর্ণ করেন ; তাই তখনও তিনি আমার প্রাণনাথ। প্রাণনাথ ব্যতীত প্রাণের কামনা আর কে পূর্ণ করিতে পারে সখি !”

এস্থলে, শ্রীরাধার কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেম প্রদর্শিত হইতেছে।

৪৪। শ্রীকৃষ্ণের অন্য প্রেয়সী-সঙ্গেও যে স্বরূপতঃ শ্রীরাধার দুঃখ হয় না, তাহা বলিতেছেন। **যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ যে রমণীকে বাঞ্ছা করেন, সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন। **যার রূপে সতৃষ্ণ**—যে রমণীর রূপসুধা পান করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ লালসান্বিত। **তারে না পাঞা** ইত্যাদি—সেই রমণীকে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ দুঃখী হয়েন কেন ? সেই নারীর অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখ শ্রীকৃষ্ণের থাকিবে কেন ? আমি সেই নারীকে আনিয়া কৃষ্ণকে দিয়া কৃষ্ণকে সুখী করিব।

সেই নারী যদি কৃষ্ণের নিকটে আসিতে অনিচ্ছুক হয়, তাহা হইলে কিরূপে তাহাকে আনিবেন, এক্ষণে তাহা বলিতেছেন।

মুঞি তার পায়ে ইত্যাদি—সেই রমণী যদি কৃষ্ণের সহিত সঙ্গমে অনিচ্ছুক হয়, তবে আমি তাহার নিকটে

কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন ভর্ৎসনে।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান
ছাড়ে মান অলপ সাধনে॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাইয়া, তাহার পায়ে ধরিয়া মিনতি করিব ; অনুনয়-বিনয়ে তাহাকে সম্মত করিয়া তাহার হাতে ধরিয়া কৃষ্ণের কাছে লইয়া যাইব এবং তাহার সঙ্গে কৃষ্ণের ক্রীড়া করাইয়া কৃষ্ণকে সুখী করিব।

"সখি! কৃষ্ণ যদি কোনও রমণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত লালসান্বিত হয়েন, আর যদি সেই রমণী কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে কৃষ্ণের প্রাণে কতইনা দুঃখ হয়! আমার প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের এই দুঃখ আমার প্রাণ কিরূপে সহ্য করিতে পারে সখি! আমার প্রাণ-বল্লভ কৃষ্ণকে কেন এই দুঃখ সহ্য করিতে দিব! সেই রমণীকে আনিয়া আমি কৃষ্ণের দুঃখ দূর করিব। আমি সেই রমণীর গৃহে যাইব, যাইয়া তাহাকে অনুনয়-বিনয় করিব, তাহার পায়ে পড়িয়া তাহাকে সম্মত করাইব—তারপর, আমি নিজে তাহার হাতে ধরিয়া আনিয়া আমার প্রাণবল্লভের হাতে অর্পণ করিব, তাহার সঙ্গে আমার প্রাণবল্লভের ক্রীড়া করাইয়া আমার প্রাণবল্লভকে সুখী করিব—আমার প্রাণের গূঢ়তম সাধ পূরাইব।"

শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত ব্রজগোপীদিগের যে কতদূর ব্যাকুলতা, তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে বাহ্যিক সম্ভোগাদির প্রাধান্য নহে, প্রাধান্য—শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত ব্যাকুলতার ; বাহ্যিক আচরণ, সেই ব্যাকুলতার একটা অভিব্যক্তি মাত্র।

৪৫। প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত যদি কৃষ্ণের অভিপ্রেত রমণীর পায়ে ধরিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমে সম্মত করাইতে শ্রীরাধা প্রস্তুত হয়েন এবং নিজে চেষ্টা করিয়াও তাহাদের সঙ্গম করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে পারিলেই নিজে কৃতার্থ হইলেন বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের অন্য গোপীর কুঞ্জে গমনাদির জন্য শ্রীরাধা মান করিতেন কেন? শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন-ভর্ৎসনই বা করিতেন কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ" ইত্যাদি ত্রিপদীতে—কান্তাকৃত তাড়ন-ভর্ৎসনে, এবং মানে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন বলিয়াই শ্রীরাধা এ সমস্ত করিতেন।

রোষ—প্রণয়-রোষ ; রোষাভাস। রোষ অর্থ ক্রোধ ; অনিষ্টসাধনই রোষের তাৎপর্য্য ; যেমন শত্রুর প্রতি রুষ্ট হইয়া লোক তাহার অনিষ্ট করে, তাহাকে বধ পর্য্যন্ত করে। কিন্তু শিশু-পুত্রের প্রতি স্নেহময়ী জননীর, প্রণয়ীর প্রতি প্রণয়িনীর যে রোষ সময় সময় দেখা যায়, শিশুর বা প্রণয়ীর অনিষ্ট-সাধন বা মনঃকষ্ট উৎপাদন সেই রোষের উদ্দেশ্য নহে—শিশুর মঙ্গল-বিধান, বা প্রণয়ীর সুখোৎপাদন বা সুখোৎপাদনের হেতু উদ্ভাবনই এইরূপ রোষের উদ্দেশ্য ; স্নেহ বা প্রণয়ই এইরূপ রোষের ভিত্তি ; কিন্তু শত্রুর প্রতি যে রোষ, হিংসাই তাহার ভিত্তি, হিংসামূলক রোষই বাস্তবিক রোষ ; আর স্নেহমূলক বা প্রণয়মূলক রোষকে রোষ না বলিয়া রোষাভাস বলাই সঙ্গত ইহা দেখিতে রোষের ন্যায় দেখায়। কিন্তু বাস্তবিক রোষ নহে, ইহার উদ্দেশ্য রোষের বিপরীত। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদিগের যে রোষ, তাহাও প্রণয়রোষ, রোষাভাস

সাধারণ রোষ ও প্রণয়-রোষে পার্থক্য এই যে, সুখভোগে বিঘ্ন জন্মিলে বিঘ্নকারীর উপরে জন্মে রোষ ; আর প্রিয়ব্যক্তি নিজে যদি এমন কোনও কার্য্য করেন, যাহাতে তাঁহার নিজের দুঃখের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার উপরে জন্মে প্রণয়-রোষ। রোষের মূলে আত্ম-সুখানুসন্ধান, প্রণয়-রোষের মূলে, প্রিয়-সুখানুসন্ধান।

কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ—কৃষ্ণকান্তা কোনও গোপী যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয়-রোষ প্রকাশ করেন। **কৃষ্ণ পায় সন্তোষ**—কান্তার প্রণয়-রোষ দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েন। যাহাদের মধ্যে অত্যন্ত স্নেহ বা প্রণয়ের বন্ধন আছে, এইরূপ নিতান্ত আপনজন ব্যতীত অন্য কেহ প্রণয়-রোষ দেখাইতে পারে না ; মদীয়তাময় ভাবের—নিতান্ত আপনা-আপনি-ভাবের—অভিব্যক্তি-বিশেষই প্রণয়-রোষ ; তাই ইহা আস্বাদ্য—সন্তোষজনক ; কারণ,

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মদীয়তাময় ভাবের যে কোনও অভিব্যক্তিই লোকের সন্তুষ্টির কারণ হয় (১।৪।২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যে কার্য্যে কৃষ্ণের দুঃখের আশঙ্কা আছে, এমন কোনও কার্য্য যদি কৃষ্ণ করেন, তাহা হইলেই শ্রীরাধিকাদি মানবতী হইয়া তাঁহার প্রতি প্রণয়-রোষ প্রকাশ করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্য রমণীর কুঞ্জে গেলে শ্রীরাধিকাদি অনেক সময়ে রুষ্টা হয়েন; কারণ, তাহাতে কৃষ্ণের দুঃখের সম্ভাবনা আছে বলিয়া শ্রীরাধিকাদি মনে করেন। অন্য রমণী হয়তো শ্রীকৃষ্ণের মরম বুঝিয়া সেবা করিতে পারিবেনা—হয়তো শ্রীকৃষ্ণের কুসুম-কোমল অঙ্গে কঙ্কণের দাগই বসাইয়া দিবে—তাতে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত কষ্ট হইবে; এইরূপ অমর্ম্মজ্ঞা রমণীদের নিকটে কৃষ্ণ কেন কষ্ট ভোগ করিতে যায়েন—ইহা ভাবিয়াই শ্রীরাধিকাদির শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয়-রোষ। ইহার উৎপত্তি শ্রীকৃষ্ণসুখ-বাসনা হইতে, তাই ইহা শ্রীকৃষ্ণের সুখ-পোষক। যে স্থলে শ্রীকৃষ্ণের কষ্টের আশঙ্কা থাকে না, সে স্থলে শ্রীরাধা নিজেই কৌশল করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অন্য রমণীর নিকটে পাঠাইয়া দেন—যেমন নিজের সখীদের নিকটে। "যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন। তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥ নানা-ছলে কৃষ্ণ প্রেরি সঙ্গম করায়। আত্ম-কৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটী সুখ পায়॥ ২।৮।১৭১-২॥" আবার প্রেমের স্বভাব-সিদ্ধ কুটিলগতিবশতঃ বিনা কারণেও অনেক সময় শ্রীরাধিকাদি কান্তাগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয় রোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন; প্রণয়ের বৈচিত্রী হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহাও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অত্যন্ত সন্তোষজনক হইয়া থাকে। ইহাও মদীয়তাময় ভাব প্রকাশক।

সুখ পায় তাড়ন-ভৎর্সনে—অন্য রমণীর নিকটে গিয়াছেন বলিয়া শ্রীরাধা মানভরে শ্রীকৃষ্ণকে যখন তিরস্কার (ভৎর্সনা) করেন, কিম্বা নিজের কুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া (তাড়ন) দেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সুখ পায়েন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, "প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন। বেদ-স্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥ ১.৪।২৩॥"

যথাযোগ্য—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত যতটুকু মান করা যোগ্য।

মান—পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত নায়ক-নায়িকার মনোগত যে ভাবটি তাহাদের অভীষ্ট আলিঙ্গন-বীক্ষণাদির বাধা জন্মায়, উপযুক্ত বিভাবাদির সংযোগে সেই ভাবটীকে মান বলে। "দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে।—উঃ নীঃ মান।৩১।"

যথাযোগ্য করে মান—যতটুকু মান করিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি হইতে পারে, ততটুকু মান, করেন। মানের অবস্থায় শ্রীরাধার সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন অনুনয়-বিনয়াদি করিতে থাকেন, তখন শ্রীরাধা নানাভাবে মিলনে বাধা দেন; যখন বুঝেন যে আর বেশী বাধা দেওয়া সঙ্গত নহে, তখন তিনি মান ভাঙ্গিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েন।

ছাড়ে মান অলপ সাধনে—শ্রীকৃষ্ণ অল্প একটু অনুনয়-বিনয় করিলেই (সাধিলেই) শ্রীরাধা মান ছাড়িয়া দেন। ইহা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে, শ্রীকৃষ্ণকান্তা শ্রীরাধার এই মানের ভাব তাঁহার হৃদয়োত্থিত নহে, ইহা একটা অভিনয় মাত্র। বাস্তবিক ইহা অভিনয় নহে; অভিনয় কপটতাময়; তাহা সুখপোষক হয় না। মান একটী হৃদয়োত্থিত ভাব, নচেৎ ইহাতে সঞ্চারিভাবের উদ্‌গম অসম্ভব হইত। লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীরাধার হৃদয় হইতেই, কৃষ্ণসুখ-পোষণের নিমিত্ত এই মানের ভাব উদ্‌গত হয়। ইহার মূলেই যখন শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বাসনা বিদ্যমান, তখন, শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়-বিনয় ও কাতরাদি দর্শনে তাঁহার দুঃখের আশঙ্কা, মর্ম্মব্যথার আশঙ্কা করিয়া মানবতী শ্রীরাধা অল্পতেই মান ছাড়িয়া দেন।

"কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ" হইতে "অলপ সাধনে" পর্য্যন্ত ঃ—

"সখি! তোমরা হয়তো বলিতে পার যে, শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত অন্য নারীর হাতে পায়ে ধরিয়াও তাহাকে আনিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গম করাইয়া যখন কৃষ্ণকে সুখী করিতে আমি প্রস্তুত, তখন কৃষ্ণ অন্য কুঞ্জাদিতে গমন করিলে আমি মান করি কেন? তাঁর তাড়ন-ভৎর্সনই বা করি কেন? কেন করি তা শুন সখি!

সেই নারী জীয়ে কেনে,　কৃষ্ণের মর্ম্মব্যথা জানে,
তভু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজসুখে মানে কাজ,　পড়ু তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তোমরা ত জান, রসিক-শেখর কৃষ্ণের কোনও প্রেয়সী যদি তাঁহার উপর রুষ্টা হইয়া তাঁকে তিরস্কার করে, বা কুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে কৃষ্ণ অতিশয় সুখী হয়েন; তাই তাঁর প্রেয়সীরা কারণে বা অকারণে তাঁহার উপর মান করিয়া থাকেন, কৃষ্ণও তাতে অত্যন্ত সুখ পায়েন; মান করেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অল্প একটু অনুনয়-বিনয় করিলেই আবার মান ছাড়িয়া দেন—নচেৎ শ্রীকৃষ্ণের কোমল প্রাণে যে ব্যথা লাগিবে সখি! নিজের সুখের ব্যাঘাত হয় বলিয়া কৃষ্ণকান্তাগণ কৃষ্ণের উপর মান করেন না—তাঁরা মান করেন, কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত এবং মান ছাড়িয়াও দেন কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত।"

৪৬। পূর্ব্ব ত্রিপদীতে "ছাড়ে মান অলপ সাধনে" বাক্যে সূচিত হইতেছে যে, কৃষ্ণকান্তাগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে রোষ দেখান, তাহা গাঢ় রোষ নহে—অতি পাতলা রোষ, রোষের আভাস মাত্র; তাই অল্পতেই ইহা দূরীভূত হয়। বাস্তবিক যাহারা কৃষ্ণের সুখ চাহে, তাহারা কখনও কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় রোষ প্রকাশ করিতে পারেন না; কিন্তু যাহারা নিজের সুখ কামনা করে, তাহারা কৃষ্ণের মরম বুঝিতে পারে না—তাহারাই কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় রোষ প্রকাশ করিয়া থাকে। এক্ষণে একথাই বলিতেছেন।

জীয়ে কেন—কেন জীবন ধারণ করে? কেন বাঁচিয়া থাকে?

কৃষ্ণের মর্ম্মব্যথা জানে—কিরূপ ব্যবহারে কৃষ্ণের প্রাণে দুঃখ জন্মিবে, ইহা যে জানে। কান্তাকৃত গাঢ় রোষে শ্রীকৃষ্ণ প্রাণে কষ্ট পাইবেন, ইহা যে জানে।

তভু—কৃষ্ণের মর্ম্মব্যথা জানিয়াও।

গাঢ় রোষ—যে রোষ সহজে দূর হয় না। গাঢ়শব্দের অর্থ পুরু, ঘন। গায়ে যদি মাটী লাগে, তাহা হইলে জলে ধুইয়া ফেলিলেই পরিষ্কার হয়। গায়ের মাটী যদি খুব গাঢ় (ঘন এবং পুরু) হয়, তাহা হইলে ঐ মাটী ধুইয়া ফেলিতে অনেক সময় লাগে, অনেক কষ্টও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু গায়ের মাটী যদি খুব পাতলা হয়, অতি সহজেই তাহা দূর করা যায়। ২।১ বার ধুইয়া ফেলিলেই চলে। রোষ সম্বন্ধেও তদ্রূপ; যদি খুব সামান্য মাত্র রোষ হয়, তাহা হইলে দুএকটা অনুনয়-বিনয়ের কথাতে, দু'এক ফোঁটা চোখের জলেই তাহা দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু খুব বেশী গাঢ় রোষ হইলে সহজে তাহা দূর হয় না—তাহা দূর করিবার নিমিত্ত প্রণয়ী নায়ককে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়।

নিজসুখে মানে কাজ—নিজের সুখকেই কাজ (প্রধান কার্য্য বলিয়া) মানে (মনে করে)। যে রমণী কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় রোষ প্রকাশ করে, সে তাহার নিজের সুখকেই প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করে; কৃষ্ণ তাহাকে যতই সাধাসাধি করিতে থাকেন, ততই তাহার চিত্তে আনন্দ জন্মিতে থাকে; তাই, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সে তাহার রোষকে রক্ষা করিয়া থাকে, যেন কৃষ্ণও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সাধাসাধি করিয়া তাহাকে সুখ দিতে পারেন। কিন্তু এইরূপে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সাধাসাধিতে এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রেয়সীর অপ্রিয়ভাজন হইয়া থাকাতে কৃষ্ণের প্রাণে যে কত কষ্ট হইতেছে, তাহার প্রতি সেই হতভাগ্য রমণীর লক্ষ্যই থাকে না। নিজের সুখই তাহার একমাত্র লক্ষ্য।

অথবা, নিজসুখে মানে কাজ—নিজসুখের নিমিত্তই মানে (মান-বিষয়ে) তাহার কাজ (প্রবৃত্তি); কৃষ্ণকৃত অনুনয়-বিনয়াদি লাভ করিয়া নিজের প্রাণে সুখ-অনুভব করার আশাতেই সেই রমণী মান করে; কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সে মান করে না।

পড়ু তার শিরে বাজ—সেই রমণীর মাথায় বজ্র পড়ুক (বজ্রপাত হইয়া অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু হউক)। যে রমণী কৃষ্ণের সুখ চাহে না, কেবল নিজের সুখের নিমিত্তই কৃষ্ণকে কষ্ট দেয়, তার মাথায় বজ্রপাত হউক।

যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ॥
মুঞি তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা
তবে মোর সুখের উল্লাস॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"সখি! যে নারী কৃষ্ণের মরম জানে, কিসে কৃষ্ণের সুখ হয়, কিসে কৃষ্ণের দুঃখ হয়, ইহা যে জানে—সে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারে যে, কান্তার গাঢ় রোষে শ্রীকৃষ্ণ প্রাণে অত্যন্ত দুঃখ পায়েন। ইহা জানিয়াও যে নারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাঢ় রোষ দেখায়—সে কৃষ্ণের সুখ চাহে না, নিজের সুখই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। তাহার রোষ দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অনুনয়-বিনয় করিবেন—তাই সে রোষ করে; কৃষ্ণের অনুনয়-বিনয়ে তার প্রাণে সুখ জন্মে—তাই শীঘ্র সে তাহার রোষ ছাড়ে না—রোষ ছাড়িলেই যে অনুনয়-বিনয় বন্ধ হইবে—তাহার সুখের উৎস বন্ধ হইয়া যাইবে! এমন স্বসুখ-তৎপরা নারী কেন জীবিত থাকে? জীবিত থাকিয়া কেন কৃষ্ণকে কষ্ট দেওয়ার হেতু হয়? এইরূপ রমণী যত শীঘ্র মরে, ততই মঙ্গল—কৃষ্ণের দুঃখ-সম্ভাবনা ততই কমিয়া যাইবে; এমন হতভাগ্য রমণীর মাথায় বজ্রাঘাত হয় না কেন? এমন রমণী শীঘ্র মরিয়া যাউক; তাতে কৃষ্ণের সুখবৃদ্ধি হইবে। আমি চাই, একমাত্র কৃষ্ণের সুখ, ইহা ব্যতীত অপর কিছুই আমার কাম্য নহে।"

কোনও কোনও গ্রন্থে "মর্ম্মব্যথা" স্থানে, "মর্ম্ম নাহি" পাঠ আছে। অর্থ—যে নারী কৃষ্ণের মরম জানে না। যে কৃষ্ণের মরম জানে, তার পক্ষেই কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়-রোষ প্রকাশ করা সাজে—কারণ, সে বুঝিতে পারে, কতটুকু রোষে কৃষ্ণের সুখোৎপত্তি হইতে পারে। কিন্তু যে কৃষ্ণের মরম জানে না—তার পক্ষে প্রণয়রোষ প্রকাশ করা সঙ্গত নহে; আত্মসুখসর্ব্বস্বা নারী কৃষ্ণের মর্ম্ম না জানিয়াও কৃষ্ণের প্রতি রোষ করিয়া থাকে।

"নিজ সুখে মানে কাজ" স্থানে "নিজ সুখে মানে লাভ" পাঠান্তরও আছে; অর্থ—নিজের সুখকেই লাভ মনে করে।

"তার শিরে" স্থলে "তার মুণ্ডে" পাঠান্তও আছে। মুণ্ডে—মাথায়।

৪৭। শ্রীরাধা যে কেবল কৃষ্ণসুখই চাহেন, আর কিছুই চাহেন না, তাহা আরও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। শ্রীরাধিকার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্না কোনও গোপীও যদি শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সাধন হয়, তাহা হইলে সেই গোপীও শ্রীরাধিকার প্রাণসমা প্রিয়া।

"যে গোপী মোর" হইতে "সুখের উল্লাস" পর্য্যন্তঃ—"সখি! কোনও গোপী যদি আমাকে অত্যন্ত বিদ্বেষের চক্ষুতেও দেখে, কিন্তু আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ যদি তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়েন, তাহার সঙ্গে সঙ্গমাদি ইচ্ছা করেন, সেই গোপীও যদি আমার প্রাণবল্লভের অভীষ্ট সঙ্গমাদিদ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধান করে—তাহা হইলে সখি! আমার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণা হইলেও সেই গোপীকে আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বলিয়া আমি মনে করিব; সে যে, আমার প্রাণবল্লভের সুখ-সাধন! কি দিয়ে আমি তার ঋণ শোধ করিব সখি! সেই গোপীর ঘরে যাইয়া, তার দাসী হইয়া যদি তার সেবা করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি সুখী হইতে পারি।" এস্থলে সেবার জন্য উৎকণ্ঠা, দৈন্য ও বিনয় প্রকাশ পাইতেছে।

প্রাণবল্লভের সুখ-সাধন কোনও বস্তু, ব্যক্তিগত ভাবে নিজের অপ্রিয় হওয়ার হেতু থাকিলেও, শুদ্ধ-প্রেমবতী শ্রীরাধিকার অপ্রিয় হয় না, পরন্তু পরম-প্রীতির বস্তুই হইয়া থাকে। কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেমের এইরূপই স্বভাব। যেখানে প্রেম, সেখানে ব্যক্তিগত বিষয়ের চিন্তার অবকাশ নাই; কারণ, সেখানে ব্যক্তিত্বই থাকে না, প্রেমের বন্যায় সেখানে ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়; এই ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিয়াই প্রেমসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হয়।

কুষ্ঠিবিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি, পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।	স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি, তুষ্ট কৈলে মুখ্য তিন দেবা ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৮। পূর্ব্বোক্ত ত্রিপদীতে যাহা বলা হইয়াছে, কুষ্ঠিবিপ্রের রমণীর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহার বাস্তবতা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

কুষ্ঠিবিপ্রের উপাখ্যানটী এইরূপ। অত্যন্ত দরিদ্র এক বিপ্র ছিলেন; তাঁর ছিল সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ। তাঁর এক পত্নী ছিলেন; তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাধ্বী, পতিগতপ্রাণা, পতির সুখ বিধানই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। কিন্তু তাঁর পাতিব্রত্যও বিপ্রের মনকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারিল না। একটী সুন্দরী বেশ্যার রূপে বিপ্র মুগ্ধ হইলেন; কিন্তু একে নিতান্ত দরিদ্র, তাতে আবার ঘৃণিত রোগে আক্রান্ত, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির কোনও সম্ভাবনাই নাই দেখিয়া বিপ্র অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলেন; বেশ্যাটিকে নয়ন ভরিয়া একবার দেখিতে পাইলেও যেন তাঁর প্রাণ বাঁচিয়া যায়; কিন্তু তাহারও সম্ভাবনা ছিল না—কারণ, বিপ্র নিজে অচল। তাই বিপ্র যেন জীয়ন্তে মরিয়া রহিলেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নী তাঁহার মনোদুঃখের কারণ জানিতে পারিয়া ঐ দুঃখ দূর করিতে সঙ্কল্প করিলেন। অর্থ নাই—যদ্দ্বারা তিনি বেশ্যাটীকে বশীভূত করিতে পারেন। পতি-সুখ-সর্ব্বস্বা সেই বিপ্রপত্নী তখন ব্যক্তিগত ন্যায় অন্যায়ের কথা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া নিজেই দাসীর ন্যায় ঐ বেশ্যাটীর সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; সেবাদ্বারা তিনি বেশ্যাকে সন্তুষ্ট করিলেন; পরে বেশ্যাটী তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহার স্বামীকে দেখা দিতে সম্মত হইল—কিন্তু তাহাও বেশ্যার নিজ গৃহে, সে বিপ্রের গৃহে যাইতে সম্মত হইল না। বিপ্রপত্নী উল্লাসের সহিত স্বামীকে আনিতে গেলেন। বিপ্রের কিন্তু চলিবার শক্তি নাই; তাই বিপ্রপত্নী রাত্রিকালে নিজের স্বামীকে বহন করিয়া বেশ্যার গৃহে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মার্কণ্ডমুনি শূলের উপর বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন, তপস্যায় তিনি সমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন। দৈব-বিড়ম্বনায় কুষ্ঠিবিপ্রের স্পর্শে মুনির সমাধিভঙ্গ হয়—ক্রোধে মুনি শাপ দিলেন যে, রাত্রি প্রভাত হইলেই বিপ্রের যেন মৃত্যু হয়। শাপ শুনিয়া পতিব্রতা বিপ্রপত্নী প্রমাদ গণিলেন—মুনিবর তাঁহারই বৈধব্যের ব্যবস্থা করিলেন; সূর্য্যোদয় হইলেই তিনি বিধবা হইবেন, মুনির শাপ ব্যর্থ হইতে পারে না। নিজের বৈধব্য-যন্ত্রণার কথা ভাবিয়াই যে বিপ্রপত্নীর দুঃখ, তাহা নহে; অতৃপ্তবাসনা লইয়া স্বামী মরিয়া যাইবেন, ইহা ভাবিয়াই তিনি দুঃখিত। যাহাতে বিপ্রের সহসা মৃত্যু না হইতে পারে, তাহার উপায় বিধানের জন্যই তখন বিপ্রপত্নীও বলিলেন "আমি যদি পতিব্রতা হই, তবে এই রাত্রিও প্রভাত হইবে না।" সতীর বাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না—সূর্য্যের গতি স্তম্ভিত হইয়া গেল, সূর্য্য যে স্থানে ছিল, সেই স্থানেই রহিয়া গেল; রাত্রি প্রভাত হইল না। সূর্য্যোদয় না হওয়াতে পৃথিবীতে নানা অনর্থ উপস্থিত হইল। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনজনই ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বিপ্রপত্নীকে বুঝাইয়া বলিলেন, তিনি যেন সূর্য্যোদয়ে সম্মতি দেন; সূর্য্যোদয় হইলে মুনির শাপে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইবে বটে; কিন্তু তাঁহারা তৎক্ষণাৎই তাঁহার স্বামীকে আবার বাঁচাইয়া দিবেন। তাঁহাদের কথায় আশ্বস্ত হইয়া বিপ্রপত্নী সূর্য্যোদয়ে সম্মতি দিলেন; রাত্রি প্রভাত হইল; বিপ্র একবার মরিলেন বটে; কিন্তু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের কৃপায় আবার বাঁচিয়া উঠিলেন—কিন্তু কুষ্ঠময়দেহে নহে, তাঁহার রোগ দূর হইয়াছিল, বিপ্র সুন্দর দেহ পাইয়াছিলেন; আর ব্রহ্মাদির দর্শনের প্রভাবে তাঁহার বেশ্যাসক্তিও দূরীভূত হইয়াছিল।

কুষ্ঠি—কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। **রমণী—পত্নী**। **কুষ্ঠিবিপ্রের রমণী**—গলিত-কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণের পত্নী। **পতিব্রতা-শিরোমণি**—পতিব্রতা রমণীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা; কেননা, পতির সুখের নিমিত্ত নিজে তিনি বেশ্যার সেবা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। **পতি লাগি**—পতির সুখের নিমিত্ত। **কৈল বেশ্যার সেবা**—সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা বেশ্যাকে সন্তুষ্টা করিলেন। বিপ্রপত্নীর অর্থ ছিল না, যদ্দ্বারা তিনি স্বামীর অভিপ্রায়-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বেশ্যাকে বশীভূত করিতে পারেন। তাই তিনি সেবা দ্বারা তাহাকে বশীভূত করার চেষ্টা করিলেন।

কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয়-উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখি করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥ ৪৯

মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেঙ দান।
কৃষ্ণ মোরে 'কান্তা' করি, কহে 'তুমি প্রাণেশ্বরী'
মোর হয় 'দাসী' অভিমান ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি—সূর্য্যের গতিকে স্তম্ভিত করিলেন; সূর্য্য আর অগ্রসর হইতে পারিল না, যেখানে ছিল, সেখানেই রহিয়া গেল। "আমি যদি পতিব্রতা হই, তবে রাত্রি প্রভাত হইবে না"—বিপ্র-পত্নীর এই বাক্যের ফলে সূর্য্যের গতি স্তম্ভিত হইল, সূর্য্যোদয় হইতে পারিল না, রাত্রিও প্রভাত হইল না।

জিয়াইল মৃতপতি—মার্কণ্ড-মুনির শাপে রাত্রি প্রভাত হইতেই বিপ্রপত্নীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল; তাঁহার পাতিব্রত্যের মাহাত্ম্যে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের কৃপায় মৃত বিপ্র বাঁচিয়া উঠিলেন।

মুখ্য তিন দেবা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিন দেবতাকে। **তুষ্ট কৈলে** ইত্যাদি—পতিব্রতা বিপ্রপত্নী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে তুষ্ট করিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে বিপ্রপত্নী সূর্য্যোদয়ের অনুমতি দিয়াছিলেন, তাতে তাঁহারা তুষ্ট হইয়াছেন; বিশেষতঃ বিপ্রপত্নীর পাতিব্রত্য দেখিয়া তাঁহারা এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহার মৃত পতিকে বাঁচাইলেন, তাঁহার ঘৃণিত রোগ দূর করিয়া তাঁহাকে সুন্দর দেহ দিলেন এবং তাঁহার বেশ্যাসক্তিও দূর করিয়া দিলেন।

৪৯। **কৃষ্ণ মোর জীবন** ইত্যাদি—"সখি! কৃষ্ণই আমার জীবন, কৃষ্ণ ব্যতীত আমি বাঁচিতে পারি না; কৃষ্ণ আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ধন সখি! কৃষ্ণ আমার প্রাণেরও প্রাণ। তাই কৃষ্ণকে—আমার হৃদয়ের হৃদয় কৃষ্ণকে—হৃদয়ে ধরিয়া সেবা করিয়া যেন সুখী করিতে পারি—ইহাই আমার একমাত্র কাম্য বস্তু—ইহাই আমার ধ্যান, ইহাই আমার জপতপ—সমস্ত।" এস্থলে "উৎকণ্ঠা" প্রকাশ পাইতেছে।

এই মোর সদা রহে ধ্যান—কিসে কৃষ্ণকে সুখী করিতে পারিব, তাহাই আমি সর্ব্বদা চিন্তা করি।

৫০। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরাধা কৃষ্ণসুখ ব্যতীত আর কিছুই যদি কামনা না করেন, নিজের সুখ যদি তিনি একটুও না চাহেন, তবে তিনি নিজ দেহ শ্রীকৃষ্ণকে দান করিলেন কেন? নিজ দেহকে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার সামগ্রী করিলেন কেন? শ্রীকৃষ্ণের কেবল সেবা করিয়াই তো তৃপ্ত হইতে পারিতেন? আবার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গমাদি করেন কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "মোর সুখ সেবনে" ইত্যাদি।

মোর সুখ সেবনে—শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারিলেই আমার (শ্রীরাধার) সুখ, সঙ্গমে আমার নিজের কোনও বাসনা নাই। এস্থলে "সেবন"-শব্দে রতি-ক্রীড়ামূলক সঙ্গম ব্যতীত অন্য উপায়ে (পাদ-সেবাদি দ্বারা) শ্রীকৃষ্ণের সুখোৎপাদনের উপায়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে—কিন্তু আমার সহিত সঙ্গম (রতিক্রীড়া) করিতে পারিলেই শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সুখী মনে করেন। কৃষ্ণের সুখে যেমন শ্রীরাধার সুখ, তেমনি শ্রীরাধার সুখেই কৃষ্ণের সুখ, শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণেরও স্ব-সুখবাসনা নাই; ভক্তচিত্ত-বিনোদনই শ্রীকৃষ্ণের ব্রত। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥" ইহাই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোক্তি। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গমেচ্ছার মূলে রহিয়াছে শ্রীরাধার সুখবিধান, শ্রীকৃষ্ণের নিজের সুখ-বিধান নহে।

অতএব দেহ দেঙ দান—সঙ্গমে আমার নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও, শ্রীকৃষ্ণ যখন আমার সহিত সঙ্গম ইচ্ছা করেন, আমার সহিত সঙ্গম করিতে পারিলেই যখন শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সুখী মনে করেন, তখন তাঁহার সুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার সুখ-সাধন আমার এই দেহকে আমি তাঁহার চরণে অর্পণ করি—তাঁহার ক্রীড়া-সামগ্রী করিয়া দেই।

কান্তসেবা সুখপূর,　　সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
নারায়ণের হৃদে স্থিতি,　　তভু পাদসেবায় মতি,
সেবা করে দাসী-অভিমানী ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি—তাঁহার কান্তার ছায় আমার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া; লোক স্বীয় কান্তার দেহ যেমন সম্ভোগ করে, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপে আমার দেহকে সম্ভোগ করিয়া তদুপায়ে আমাকে তাঁহার কান্তাত্ব দিয়া।

কহে "তুমি প্রাণেশ্বরী"—শ্রীকৃষ্ণ আমাকে তাঁহার "প্রাণেশ্বরী" বলিয়া সম্বোধন করেন। "কহে মোরে প্রাণেশ্বরী" পাঠান্তরও আছে।

মোর হয় দাসী অভিমান—তিনি আমাকে "প্রাণেশ্বরী" বলিয়া ডাকিলেও, আমার কিন্তু "তাঁহার প্রাণেশ্বরী" বলিয়া নিজেকে মনে হয় না, তখনও আমার মনে হয়, আমি তাঁহার দাসী মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার দেহ উপভোগ করিয়া শ্রীরাধাকে তাঁহার কান্তাত্ব ও প্রাণেশ্বরিত্ব দিয়াছেন; আবার নিজেও প্রাণের অন্তস্তল হইতে তাঁহাকে "প্রাণেশ্বরী" বলিয়াই সম্বোধন করিতেছেন; তথাপি কিন্তু শ্রীরাধার মনে শ্রীকৃষ্ণের "প্রাণেশ্বরী" বলিয়া অভিমান জাগে না—শ্রীকৃষ্ণের "দাসী" বলিয়াই সর্ব্বদা অভিমান জাগে। ইহাই শ্রীরাধার কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেমের মাহাত্ম্য সূচিত করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রাণেশ্বরী যিনি হইবেন, শ্রীকৃষ্ণের দেহ, মন, প্রাণ লইয়া ক্রীড়া করিবার অধিকার তাঁহারই থাকিবে—কারণ, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের ঈশ্বরী, সুতরাং দেহ-মনেরও ঈশ্বরী। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সুখ-সাধন-বস্তু-রূপেই পরিগণিত হইয়া পড়িবেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণেশ্বরিত্বের অভিমান যাঁহার আছে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ-মন-প্রাণ যে তাঁহার সুখ-সাধন—এই ধারণাও তাঁহার স্বভাবতঃই থাকিবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সুখ-সাধন বস্তুরূপে শ্রীরাধা কোনও সময়েই মনে করেন না—এইরূপ ধারণার ছায়াও কোনও সময়ে তাঁহার মনে স্থান পায় না। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের "প্রাণেশ্বরী" বলিয়া অভিমানও কোনও সময়ে তাঁহার চিত্তে স্থান পায় না।

শ্রীরাধা চাহেন,—নিজের সুখ-দুঃখের ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়া, দাসীর ন্যায় সেবা করিয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখোৎপাদন করিতে। তাই "আমি শ্রীকৃষ্ণের দাসী" এই অভিমানই সর্ব্বদা তাঁহার চিত্তে জাগরূক।

৫১। কান্তের সহিত সঙ্গম-সুখ অপেক্ষা তাঁহার পাদসম্বাহনাদি-সেবার সুখ যে অনেক বেশী, তাহা বলিতেছেন। ইহা দ্বারা—সঙ্গম-সুখ না চাহিয়া কেন সেবা-সুখ চাওয়া হয়—তাহারও সমাধান করিতেছেন।

সুখপূর—সুখের পূর্ত্তি, সুখের সমুদ্র, পরিপূর্ণ সুখ।

কান্তসেবা সুখপূর—কান্তের পাদ-সম্বাহনাদি সেবাই সুখের সমুদ্রতুল্য; তাহা হইতেই পরিপূর্ণ সুখ পাওয়া যায়। কান্তের সেবা হইতে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহাতেই হৃদয় পূর্ণ হইয়া থাকে; তাই অন্য কোনও সুখের বাসনা হৃদয়ে স্থান পায় না।

সঙ্গম হৈতে সুমধুর—কান্তের সহিত সঙ্গমে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহা হইতে কান্তের সেবা-সুখ অনেক বেশী মধুর, আস্বাদ্য। কান্ত-সঙ্গমের সুখ হইতে কান্তসেবার সুখ পরিমাণেও অনেক বেশী (সুখপূর) এবং মধুরতায়ও অনেক শ্রেষ্ঠ। তাই সেবা-সুখ পাইলে আর সঙ্গম-সুখের নিমিত্ত কোনওরূপ লালসা জন্মে না। মধুর আস্বাদ যে পায়, গুড়ের জন্য তাহার আর লোভ থাকে না।

তাতে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী—সঙ্গমসুখ হইতে যে সেবাসুখ অনেক বেশী এবং অনেক গুণে মধুরতর, শ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণীই তাহার প্রমাণ। লক্ষ্মী কিরূপে ইহার প্রমাণস্থানীয়া হইলেন, তাহা বলিতেছেন "নারায়ণের হৃদে" ইত্যাদি বাক্যে।

নারায়ণের হৃদে স্থিতি—নারায়ণের হৃদয়ে শ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণীর স্থিতি; শ্রীনারায়ণ লক্ষ্মীদেবীকে এত প্রীতি করেন যে, সর্ব্বদা তিনি তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখেন।

এই রাধার বচন, বিশুদ্ধ প্রেম-লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌররায়।
ভাবে মন অস্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর,
মন-দেহ ধরণ না যায়॥ ৫২

ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বূনদ হেম,
আত্মসুখের যাহে নাহি গন্ধ।
সে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে,
পদে কৈল অর্থের নিবন্ধ॥ ৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তভু পাদসেবায় মতি—সর্ব্বদা নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী হইয়াও, তাতে তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না; নারায়ণের পাদ-সেবার নিমিত্তই তাঁহার ইচ্ছা (মতি) হয়।

সেবা করে—লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের সেবা (পাদ-সেবাদি) করেন (বক্ষঃস্থলে অবস্থিতি ত্যাগ করিয়া)।

দাসী-অভিমানী—নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী প্রেয়সী হইয়াও, নারায়ণের প্রাণেশ্বরী হইয়াও শ্রীলক্ষ্মীদেবী নিজেকে নারায়ণের দাসী মনে করিয়াই সেবাদি করিয়া থাকেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, "প্রেয়সী"-অভিমান অপেক্ষা "দাসী"-অভিমানই বেশী লোভনীয়; আর কান্তের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিয়া বিহারাদি করা অপেক্ষা কান্তের পাদ-সম্বাহনাদি-সেবার আকর্ষণই অনেক বেশী; স্বয়ং লক্ষ্মীও নারায়ণের বক্ষঃস্থল ত্যাগ করিয়া নারায়ণের পাদ-সম্বাহনাদির নিমিত্ত লুব্ধা হয়েন।

সঙ্গম-সুখ অপেক্ষাও সেবা-সুখের আতিশয্য খ্যাপন করায় সেবা-পরায়ণা-মঞ্জরীদিগের অসমোর্দ্ধ আনন্দই সূচিত হইতেছে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম ইচ্ছা করেন না, যে স্থানে কৃষ্ণকৃত-সঙ্গম-চেষ্টার সম্ভাবনা আছে, সেই স্থানেও তাঁহারা যাইতে চাহেন না; কেবলমাত্র সেবা নিয়াই তাঁহারা ব্যাপৃত; তাই তাঁহাদের আনন্দও অসমোর্দ্ধ।

এপর্য্যন্ত রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর প্রলাপ-বচন শেষ হইল। ইহার পরবর্ত্তী ত্রিপদীগুলি গ্রন্থকারের উক্তি।

৫২। **এই রাধার বচন**—"আমি কৃষ্ণপদদাসী" হইতে "সেবা করে দাসী-অভিমানী" পর্য্যন্ত উক্তিসমূহ।

বিশুদ্ধ প্রেম—স্বসুখ-বাসনাগন্ধশূন্য কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেম।

বিশুদ্ধ-প্রেম-লক্ষণ—ইহা "রাধার বচনের" বিশেষণ। বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ আছে যাহাতে সেই রাধা-বচন। "আমি কৃষ্ণপদ-দাসী" হইতে "সেবা করে দাসী-অভিমানী" পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ-প্রেমের লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে। নিজের সুখ-দুঃখের—মান-অভিমানাদির কোনওরূপ অনুসন্ধান না রাখিয়া, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণেরই দাসী অভিমানে তাঁহার সেবা করা—ইহাই বিশুদ্ধ-প্রেমের লক্ষণ।

আস্বাদয়ে ইত্যাদি—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বিশুদ্ধ-প্রেমের লক্ষণযুক্ত শ্রীরাধার বচনসমূহ আস্বাদন করেন। **ভাবে**—শ্রীরাধার ভাবে।

ভাবে মন অস্থির—শ্রীরাধার উক্তি আস্বাদন করিবার সময়ে, নানাবিধ সঞ্চারিভাবের উদয়ে রাধা-ভাবাবিষ্ট প্রভুর মন অস্থির হইয়া গেল। **সাত্ত্বিক**—অশ্রু, কম্প, স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিকের উদয়ে। **ব্যাপে শরীর**—শরীরে ব্যাপ্ত হয়। আস্বাদন-কালে অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাব প্রভুর দেহে প্রকটিত হইল। **মন-দেহ ধরণ না যায়**—মন ও দেহকে স্থির করা যায় না। নানাবিধ ভাবের উদয়ে প্রভুর মন অস্থির, আর কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে প্রভুর দেহ অস্থির।

৫৩। **জাম্বূনদ**—সম্যক্রূপে পবিত্র, যাহাতে অপবিত্রতার গন্ধ মাত্রও নাই। **হেম**—স্বর্ণ, সোনা। **জাম্বূনদ হেম**—অতি বিশুদ্ধ স্বর্ণ; যাহাতে খাদের গন্ধ মাত্রও নাই, এরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণ। **আত্ম-সুখের**—নিজের সুখের। **গন্ধ**—লেশমাত্রও। ২।২।৩৮-পয়ারের টীকায় "জাম্বূনদ"-শব্দের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

ব্রজের বিশুদ্ধ-প্রেম ইত্যাদি—ব্রজপ্রেম অতি বিশুদ্ধ স্বর্ণের ছায় পবিত্র; ইহাতে স্ব-সুখবাসনারূপ মলিনতা নাই। বিশুদ্ধ স্বর্ণে যেমন স্বর্ণ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর লেশমাত্রও থাকে না, তদ্রূপ বিশুদ্ধ ব্রজপ্রেমেও

এইমত প্রভু তত্তদ্ভাবাবিষ্ট হঞা।
প্রলাপ করিল তত্তৎ শ্লোক পড়িয়া ॥ ৫৪

পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিল।
সেই অষ্টশ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল ॥ ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৃষ্ণের সুখ-বাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনাই নাই; ইহাতে স্ব-সুখবাসনার গন্ধমাত্রও নাই। **সে প্রেম**—সেই বিশুদ্ধ ব্রজপ্রেম। **এই শ্লোক**—"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোক। **সে প্রেম জানাইতে** ইত্যাদি—কাম-গন্ধহীন বিশুদ্ধ ব্রজপ্রেমের মর্ম্ম জগতে প্রচার করিবার নিমিত্ত প্রভু "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন। **পদে**—"আমি কৃষ্ণপদ-দাসী" ইত্যাদি পদে। **অর্থের নিবন্ধ**—শ্লোকার্থের বৃত্তি, অর্থের বিবৃতি।

পদে কৈল ইত্যাদি—কেবল শ্লোকটীর রচনা করিয়াই পরমকরুণ প্রভু ক্ষান্ত হয়েন নাই। সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্লোক,—বিশেষতঃ অতি সংক্ষিপ্ত—সকলে হয়তো ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না। তাই তিনি কৃপা করিয়া "আমি কৃষ্ণপদদাসী" ইত্যাদি পদ-সমূহে উক্ত শ্লোকটীর বিস্তৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

"পদে" স্থানে "পাদ" এবং "পদ" পাঠান্তরও আছে। অর্থ—অর্থের নিবন্ধরূপে (আমি কৃষ্ণপদদাসী ইত্যাদি) পদ (পাদ = পদ) করিলেন।

"নিবন্ধ" স্থলে "নির্ব্বন্ধ" পাঠও আছে। নির্ব্বন্ধ—পুনঃ পুনঃ যত্ন। পুনঃ পুনঃ যত্ন করিয়া (নানারকম উদাহরণাদি দ্বারা বক্তব্য বিষয়টীকে সম্যক্রূপে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করিয়া) শ্লোকটীর অর্থ প্রকাশ করার নিমিত্ত প্রভু "আমি কৃষ্ণপদদাসী" ইত্যাদি পদ প্রণয়ন করিয়াছেন।

৫৪। **তত্তদ্ভাবাবিষ্ট**—শ্রীরাধার সেই সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া; যে যে ভাবের বশীভূত হইয়া শ্রীরাধা "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোকাদি বলিয়াছিলেন, সেই সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া।

তত্তৎ শ্লোক—সেই সেই শ্লোক; ভাবের আবেশে শ্রীরাধা যে সকল শ্লোক বলিয়াছিলেন। "যুগায়িতং নিমেষেণ" ও "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" ইত্যাদি শ্লোক।

৫৫। **অষ্টশ্লোক**—চেতোদর্পণমার্জ্জনাদি আটটী শ্লোক। লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রভু পূর্ব্বেই এই আটটী শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন; পরে প্রেমোন্মাদ-অবস্থায় শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া রায়রামানন্দাদির সঙ্গে সেই আটটী শ্লোক আস্বাদন করিলেন এবং প্রলাপ করিয়া তাহাদের অর্থ প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর রচিত এই আটটী শ্লোককে শিক্ষাষ্টক-শ্লোক বলে।

এই আটটী শ্লোকের বেশ সুন্দর একটা ধারাবাহিকতা আছে; জীবের পক্ষে সার কথা যাহা শিক্ষণীয়, তাহাই এই শিক্ষাষ্টকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ "চেতোদর্পণ" শ্লোকে শ্রীশ্রীনাম-কীর্ত্তনের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া পরমকরুণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু মায়াবদ্ধ জীবকে নাম-সঙ্কীর্ত্তনে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; নাম-সঙ্কীর্ত্তনে প্রলুব্ধ করার হেতু এই যে, নাম-সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীভগবানের তো অনন্ত নাম; কোন নাম কীর্ত্তনীয়? এই প্রশ্নের সমাধানের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় প্রভু "নাম্নামকারি" ইত্যাদি (শিক্ষাষ্টকের) দ্বিতীয় শ্লোকে জানাইলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন ভিন্ন অভিলাষ বশতঃ ভগবানের একই নামে সকলের রুচি না হইতে পারে; তাই পরমকরুণ শ্রীভগবান্ তাঁহার অনন্ত নাম প্রকটিত করিয়াছেন, যেন প্রত্যেক লোকই স্বীয় অভিরুচি-অনুসারে ভগবানের যে কোনও নাম কীর্ত্তন করিতে পারে। প্রত্যেক নামই যেন অভীষ্টফলপ্রদ হয়, তাই ভগবান্ প্রত্যেক নামেই স্বীয় সমগ্র অচিন্ত্য শক্তি বিভাগ করিয়া অর্পণ করিয়াছেন; কেবল ইহাই নহে—যাহাতে যে কোনও লোক, যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও স্থানে নাম-কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তিনি নাম-গ্রহণের নিমিত্ত কোনও বিশেষ নিয়মেরও প্রবর্ত্তন করেন নাই। এত কৃপা জীবের প্রতি শ্রীভগবানের!

প্রভুর শিক্ষাষ্টকশ্লোক যেই পড়ে-শুনে।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥ ৫৬

যদ্যপিহ প্রভু কোটিসমুদ্র-গম্ভীর।
নানাভাবচন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভগবন্নামের অনন্ত ফল কীর্ত্তিত হইলেও নাম-কীর্ত্তনের মুখ্যফল—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমপ্রাপ্তি। নিরপরাধ জীব একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারে; কিন্তু অপরাধী জীবের পক্ষে তাহা হয় না। কিরূপে নাম-কীর্ত্তন করিলে অপরাধী জীব শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিতে পারে, পরমকরুণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু "তৃণাদপি" ইত্যাদি (শিক্ষাষ্টকের) তৃতীয় শ্লোকে তাহা উপদেশ করিয়াছেন। "তৃণাদপি" শ্লোকানুযায়িনী চিত্তের অবস্থা অপরাধী মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে সহজ নহে; কিন্তু শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কি ভাবে নাম গ্রহণ করিলে ঐ অবস্থা জন্মিতে পারে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে বোধ হয়, তাহাই উপদেশ দিলেন—নাম-কীর্ত্তনের সঙ্গে প্রার্থনা করিতে হইবে—"হে প্রভো! ধন-জনাদি কিছুই আমি চাহিনা; মায়াবশে যদিও ধন-জনাদির কামনা চিত্তে উদিত হয়, তথাপি প্রভো, তুমি ধন-জনাদি আমাকে দিওনা—তোমার চরণে অচলা অহৈতুকী ভক্তিই তুমি কৃপা করিয়া আমাকে দিও, ইহাই প্রভু তোমার চরণে প্রার্থনা (ন ধনং ইত্যাদি চতুর্থ শ্লোক)।" আরও প্রার্থনা করিতে হইবে—"হে নন্দ-তনুজ! আমি আপন কর্ম্মদোষে বিষম সংসার-সমুদ্রে নিপতিত হইয়াছি; তথাপি প্রভু! আমি তোমারই নিত্যদাস—কৃপা করিয়া তুমি আমাকে তোমার দাস বলিয়া মনে কর; তোমার চরণধূলির ন্যায় সর্ব্বদা তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাহাতে তোমার চরণ-সেবা করিতে পারি, তাহাই কর প্রভো! (অয়ি নন্দ-তনুজ ইত্যাদি পঞ্চমশ্লোক)"—আর প্রার্থনা করিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম; "প্রভো! এমন দিন আমার কবে হইবে—যখন তোমার নামকীর্ত্তন করিতে করিতে নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবে, অঙ্গ পুলকাবলিতে ভূষিত হইবে, আর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইবে—গদ্‌গদ্ বাক্যমাত্র স্ফুরিত হইবে (নয়নং গলদশ্রুধারয়া ইত্যাদি ষষ্ঠ শ্লোক।)" এইরূপ প্রার্থনার সহিত নামকীর্ত্তন করিতে করিতেই চিত্তে তৃণাদপিশ্লোকানুযায়ী ভাবের উদয় হইবে, কৃষ্ণপ্রেম আবির্ভূত হইবে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম আবির্ভূত হইলে সাধকের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহাও "যুগায়িতং নিমেষেণ" ইত্যাদি সপ্তম শ্লোকে বলিয়াছেন—হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইলেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধকের উৎকট-লালসা জন্মিবে, কৃষ্ণের বিরহ স্ফুরিত হইবে, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজনিত উৎকণ্ঠায় এক নিমেষ-পরিমিত সময়কেও ভক্তের নিকটে যেন এক যুগের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া মনে হইবে—তাঁহার নয়নে সর্ব্বদাই বর্ষার ধারার ন্যায় অশ্রুধারা বিগলিত হইবে, আর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে সমস্ত জগৎই তাঁহার নিকট এক বিরাট শূন্য বলিয়া মনে হইবে।

প্রেমিক ভক্তের অবস্থা বলিয়া ব্রজপ্রেমের স্বরূপটীও প্রভু "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" ইত্যাদি অষ্টম শ্লোকে বিবৃত করিয়াছেন—এই প্রেম কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়; নিজের সুখ-দুঃখ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ভাল-মন্দ ইত্যাদি সমস্তের ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়া দাসীর ন্যায় সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করার চেষ্টাই ব্রজপ্রেমের একমাত্র তাৎপর্য্য।

৫৬। **পড়ে শুনে**—পাঠ করে এবং শ্রবণ করে।

এই পয়ারে শিক্ষাষ্টক-শ্লোকের শ্রবণ-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বলিতেছেন (গ্রন্থকার)।

৫৭। **কোটি-সমুদ্রগম্ভীর**—সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য অপেক্ষাও কোটিগুণ গাম্ভীর্য্য যাঁহার।

নানাভাবচন্দ্রোদয়ে—নানাবিধ সঞ্চারি-ভাবাদিরূপ চন্দ্রের উদয়ে।

সমুদ্র স্বভাবতঃ গম্ভীর (অচঞ্চল) হইলেও চন্দ্রোদয়ে যেমন তরঙ্গাদির আকারে তাহার চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তদ্রূপ, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু স্বভাবতঃ সমুদ্র অপেক্ষাও কোটি গুণে গম্ভীর হইলেও, নানাবিধ সঞ্চারিভাবের উদয়ে তিনি সময় সময় অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন।

যেই যেই শ্লোক জয়দেবে ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে ॥ ৫৮
সেই-সেই-ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই-সেই-ভাবাবেশে করে আস্বাদন ॥ ৫৯
দ্বাদশবৎসর ঐছে দশা রাত্রি-দিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুইবন্ধুসনে ॥ ৬০
সেই সব লীলারস আপনে অনন্ত।
সহস্রবদনে বর্ণে'—নাহি পায় অন্ত ॥ ৬১
জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি, তাহা কে পারে বর্ণিতে।
তার এক কণ স্পর্শি আপনা শোধিতে। ৬২
যত চেষ্টা, যত প্রলাপ, নাহি তার পার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার ॥ ৬৩
বৃন্দাবনদাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেইসব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল ॥ ৬৪
তার ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাঢ়িল ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৮-৯। "যেই যেই শ্লোক" হইতে "করে আস্বাদন" পর্য্যন্ত দুই পয়ার। শ্রীমদ্ভাগবতে, শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দে, রায়-রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ-নাটকে এবং বিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে শ্রীরাধার বহুবিধ ভাবদ্যোতক যে সমস্ত শ্লোক আছে, প্রভু সেই সমস্ত শ্লোক পাঠ করিতেন এবং যেই শ্লোকে শ্রীরাধার যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু সেই শ্লোক আস্বাদন করিতেন।

জয়দেবে—জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দে। **ভাগবতে**—শ্রীমদ্ভাগবতে। **রায়ের নাটকে**—রায়-রামানন্দ রচিত শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ নাটকে; **কর্ণামৃতে**—শ্রীবিল্বমঙ্গল-প্রণীত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থে। **সেই সেই ভাবাবেশে**—শ্লোকে শ্রীরাধার যে ভাব প্রকটিত হইয়াছে, সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া।

৬০। **দ্বাদশ বৎসর**—প্রভুর নীলাচলবাসের শেষ বার বৎসর। **ঐছে দশা**—ঐরূপ অবস্থা; শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্টতা। **রাত্রিদিনে**—দিনে ও রাত্রিতে সকল সময়ে প্রভুর রাধাভাবের আবেশ থাকিত। **দুই বন্ধু**—রায়-রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর। ইঁহাদের সঙ্গেই প্রভু শেষ বার বৎসর রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণরস আস্বাদন করিতেন, গৌর-লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেন।

৬১। শ্রীমন্মহাপ্রভু শেষ বার বৎসরে যে সমস্ত লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন স্বয়ং অনন্তদেব নিজের সহস্র বদনে বর্ণন করিয়াও তাহার অন্ত পায়েন না।

৬২। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী নিজের দৈন্য জানাইতেছেন। স্বয়ং অনন্তদেব ভগবদংশ হইয়াও সহস্র-বদনে যাহা বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন, ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব আমি তাহা কিরূপে বর্ণন করিব। তবে যে বর্ণনের চেষ্টা করিয়াছি, তাহাকে লীলাবর্ণনা বলা যায় না; কেবল আত্ম-শোধনের উদ্দেশ্যে আমি সেই অনন্ত লীলাসমুদ্রের এক কণিকামাত্র স্পর্শ করিয়াছি।

আপনা শোধিতে—আত্ম-শোধনের নিমিত্ত; নিজেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে।

৬৩। **যত চেষ্টা**—প্রভুর যত আচরণ।

যত প্রলাপ—প্রভুর যত প্রলাপ। **নাহি তার পার**—তাহার অন্ত নাই।

৬৪-৫। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে লীলাবর্ণনার প্রকার বলিতেছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আদি নাম শ্রীচৈতন্যমঙ্গল) প্রভুর যে সকল লীলা বর্ণন করিয়াছেন, কবিরাজ-গোস্বামী সেই সকল লীলা বর্ণন করেন নাই, সূত্রাকারে উল্লেখমাত্র করিয়া গিয়াছেন। আর বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে সকল লীলা বর্ণন করেন নাই, কবিরাজ-গোস্বামী সে সকল লীলাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তৃতির ভয়ে কোনও লীলাই বিস্তৃতরূপে বর্ণন করেন নাই; তথাপি অনেক লীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতে হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থ খুব বড় হইয়া গিয়াছে।

অতএব সে সব লীলা নারি বর্ণিবারে
সমাপ্তি করিল লীলাকে করি নমস্কারে ॥ ৬৬
যে কিছু কহিল এই দিগ্‌দরশন।
এই-অনুসারে হবে আর আস্বাদন ॥ ৬৭
প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে ॥ ৬৮
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ ॥
চৈতন্যচরিতবর্ণন কৈল সমাপন ॥ ৬৯
আকাশ অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ ॥ ৭০
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা—নাহি ওর-পার।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার ? ॥ ৭১
যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি, তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল ॥ ৭২
নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস।
চৈতন্যলীলার তেঁহো হয় আদি ব্যাস ॥ ৭৩
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥ ৭৪
'যে কিছু বর্ণিল—সেহো সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারি' গ্রন্থে রাখিয়াছে লিখিয়া ॥৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই দুই গ্রন্থে বর্ণিত লীলা একত্র করিলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার সম্যক্ জ্ঞান জন্মিতে পারে।

প্রথম যে লীলা বর্ণিল—শ্রীচৈতন্যভাগবতে। শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। **তার ত্যক্ত**—শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পরিত্যক্ত। **অবশেষ**—অবশিষ্ট লীলা; বৃন্দাবনদাস যাহা বর্ণন করেন নাই; তাঁহার বর্ণনার পরে যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা। **লীলার বাহুল্যে**—অধিক সংখ্যক লীলা বলিয়া।

৬৬। **সে সব লীলা** ইত্যাদি—গ্রন্থের আয়তন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে সকল লীলা বর্ণন করেন নাই, সে সকল লীলাও আর সমস্ত বর্ণন করিতে পারিলাম না।

৬৮। **বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি**—লীলাতে আমার বুদ্ধির প্রবেশ নাই; লীলা বুঝিতে পারি না। **তাতে**—সেই জন্য; বুদ্ধি-প্রবেশ নাই বলিয়া।

৭২। **যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি**—যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি। "যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি তাবৎ" স্থলে "যতেক বুদ্ধ্যের গতি ততেক" পাঠান্তরও আছে। অর্থ একই।

৭৩। **নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র**—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপার পাত্র। **তেঁহো**—বৃন্দাবনদাস। **আদি ব্যাস**—প্রথম বিস্তারক। ব্যাসদেব যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণন করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীবৃন্দাবন-দাসও সর্ব্বপ্রথমে শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীগৌরলীলা বর্ণন করিয়াছেন। তাই শ্রীবৃন্দাবনদাস গৌরলীলার আদি ব্যাস (সর্ব্বপ্রথম লীলাবর্ণনকারী)।

৭৪। **তাঁর আগে**—শ্রীবৃন্দাবনদাসের সম্মুখে।

যদিও শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত লীলাই নিত্যানন্দের কৃপায় অবগত ছিলেন, তথাপি অল্প কয়েকটী লীলা বর্ণন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন।

৭৫। শ্রীলবৃন্দাবনদাস নিজ গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়াছেন—"আমি আমার গ্রন্থে (শ্রীচৈতন্যভাগবতে) শ্রীমন্-মহাপ্রভুর লীলা যাহা কিছু লিখিলাম, তাহাও অতি সংক্ষেপে লিখিলাম; আর আমি লিখিতে পারি না।" বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর সূত্রমধ্যে যে সকল লীলা বর্ণন করিবেন বলিয়া লিখিয়াছিলেন, সে সকল লীলাও সমস্ত বর্ণন করিতে পারেন নাই; শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর লীলাবর্ণনে তিনি এতই আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ঐ লীলাই বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন; তাহাতে গ্রন্থ অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় গৌরলীলা সম্যক্ বর্ণন করেন নাই। "চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত

চৈতন্য-মঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সেই বচন শুন সেই পরম প্রমাণে— ॥ ৭৬
'সংক্ষেপে কহিল, বিস্তার না যায় কথনে।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিব বর্ণনে॥' ৭৭
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সত্য কহে—'ব্যাস আগে করিব বর্ণনে' ॥ ৭৮
চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু দুগ্ধাব্ধিসমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তেঁহো কৈল পান ॥ ৭৯
তাঁর ঝারীশেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট, তৃষ্ণা মোর গেলা ॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপার। বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার। বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন। সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন। নিত্যানন্দ-লীলাবর্ণনে হইল আবেশ॥ চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥ ১।৮।৪২-৪॥"

"রাখিয়াছে লিখিয়া" স্থলে "রাখিয়াছে উট্টঙ্কিয়া" পাঠও আছে। উট্টঙ্কিয়া—উল্লেখ করিয়া, লিখিয়া।

৭৬। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে সমস্ত-লীলাবর্ণন করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে তিনি লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার নিজের উক্তিই ইহার প্রমাণ।

চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের গ্রন্থের নাম প্রথমে ছিল "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল"; পরে ইহার নাম হয় "শ্রীচৈতন্যভাগবত"।

৭৭। গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থানেই লিখিয়াছেন যে, "গৌরলীলা আমি সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম; বিস্তার করিতে পারিতেছি না; ভবিষ্যতে বেদব্যাস এই লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিবেন।"

৭৮। **চৈতন্যমঙ্গলে**—চৈতন্যভাগবতে। ইহা পূর্ব্বপয়ারের মর্ম্ম। চৈতন্যভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত পয়ারেও দেখিতে পাওয়া যায়:—"শেষখণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস। বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস॥ আদি, ১ম অঃ।"

সত্য কহে ইত্যাদি—কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন:—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে বলিলেন, "ভবিষ্যতে ব্যাসদেব এই লীলা বর্ণন করিবেন" এ কথা সত্যই; কারণ, যিনি শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরলীলা শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহার কলিযুগলীলা বর্ণন করিবার অধিকারও সেই ব্যাসদেবেরই; তাই আমিও ইহা বর্ণন করিতে পারিলাম না; বাস্তবিক ব্যাসদেবই ভবিষ্যতে বর্ণন করিবেন।

৭৯। **চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু**—চৈতন্যলীলারূপ অমৃতের সমুদ্র। **দুগ্ধাব্ধি সমান**—দুগ্ধের সমুদ্রের ন্যায় স্বাদু এবং অনন্ত।

ঝারী—গাড়ু; জলপাত্র।

তেঁহো—বৃন্দাবনদাস।

শ্রীচৈতন্যের লীলা সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত; কেহই ইহা সম্যক্ বর্ণন করিতে পারে না। যিনি যতটুকু বর্ণনা করিয়া তৃপ্তি পায়েন, তিনি ততটুকুই বর্ণনা করেন; বৃন্দাবনদাসও যতটুকু বর্ণনা করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন, ততটুকুই বর্ণনা করিয়াছেন।

চৈতন্যলীলারূপ অমৃত-সমুদ্র দুগ্ধ-সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত; বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ঝারী ভরিয়া তাঁহার তৃষ্ণানুরূপ (যে পর্য্যন্ত তৃষ্ণানিবৃত্তি না হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত) পান করিয়াছেন।

চৈতন্যলীলাকে সমুদ্রের সঙ্গে এবং লীলাবর্ণন-শক্তিকে ঝারীর সঙ্গে তুলনা দেওয়ায়, লীলাবর্ণন-শক্তির দৈন্য সূচিত হইতেছে।

৮০। **তাঁর**—বৃন্দাবনদাসের। **ঝারীশেষামৃত**—ঝারীতে অবশিষ্ট যে অমৃত ছিল। বৃন্দাবনদাস যে ঝারীতে লীলামৃত পান করিয়াছিলেন, তাঁহার পরে ঝারীতে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাই আমি পান

আমি অতি ক্ষুদ্রজীব—পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী ॥ ৮১
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥ ৮২
'আমি লিখি, এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুতলীসমান ॥ ৮৩
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥ ৮৪
নানারোগে গ্রস্ত, চলিতে-বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল,—রাত্রিদিনে মরি ॥৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিলাম; তাহা পান করিয়াই (ততেকে) আমি তৃপ্ত হইলাম, আর পান করিবার ইচ্ছা আমার নাই (তৃষ্ণ মোর গেলা)।

ইহাতে সূচিত হইতেছে যে, বৃন্দাবনদাসঠাকুর যে যে লীলা বর্ণন করিবেন বলিয়া সূত্রমধ্যে লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহা যাহা তিনি বর্ণন করেন নাই, তাহা তাহাই কবিরাজ-গোস্বামী বর্ণন করিলেন।

৮১-৮২। **রাঙ্গাটুনি**—এক রকম অতি ক্ষুদ্র পক্ষী।

পানী—জল।

"আমি অতি ক্ষুদ্রজীব" হইতে "লীলার বিস্তার" **পর্য্যন্ত**:—গ্রন্থকার কবিরাজগোস্বামী নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, "আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্রজীব—রাঙ্গাটুনি পক্ষীর ন্যায় ক্ষুদ্র। রাঙ্গাটুনি যেমন পিপাসার্ত্ত হইয়া সমুদ্রের জল পান করিতে যায়, কিন্তু সমুদ্রের একবিন্দু জল পান করিয়াই তৃপ্ত হয়; আমিও তদ্রূপ অনন্ত-বিস্তৃত লীলা বর্ণন করিবার নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া লীলাবর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াছি; কিন্তু সেই লীলাসমুদ্রের এক কণিকা স্পর্শ করিয়াই তৃপ্ত হইয়াছি। সমগ্র শ্রীচৈতন্যলীলার তুলনায় আমার বর্ণিত লীলা যে কত ক্ষুদ্র, এই দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বুঝিয়া লইবে। একটী রাঙ্গাটুনি যতটুকু জল পান করিতে পারে, সমুদ্রের তুলনায় তাহা যত ক্ষুদ্র, শ্রীচৈতন্যের সমগ্র লীলার তুলনায়, আমার বর্ণিত লীলাও তত ক্ষুদ্র।"

৮৩। **আমি লিখি** ইত্যাদি—কবিরাজগোস্বামী বলিতেছেন, "আমি শ্রীচৈতন্যের লীলা বর্ণনা করিতেছি বলিয়া যে অভিমান করিতেছি, তাহাও মিথ্যা অভিমান মাত্র; কারণ, এই লীলা বাস্তবিক আমি বর্ণনা করিতেছি না; আমার এই শরীর কাঠের পুতুলের ন্যায় শক্তিহীন। কাঠের পুতুল যেমন লীলাগ্রন্থ লিখিতে পারে না, আমারও তদ্রূপ কোন গ্রন্থ লেখার শক্তি নাই।" তবে কে এই গ্রন্থ লিখিতেছেন? তাহা ব'লতেছেন—"কাঠের পুতুল যেমন নিজে নাচিতে পারে না, পুতুল-ক্রীড়ক তাহাকে নাচায়; তদ্রূপ আমারও লিখিবার শক্তি নাই, শ্রীরূপ-সনাতনাদির কৃপা এবং শ্রীগৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত এবং শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনের কৃপা আমাদ্বারা এই গ্রন্থ লিখাইতেছেন।"

৮৪-৫। তাঁহার শরীর যে গ্রন্থলিখনের উপযোগী নহে, তাহা বলিতেছেন দুই পয়ারে।

বৃদ্ধ—বুড়া। **জরাতুর**—বার্দ্ধক্যে কাতর, অচল। **আমি অন্ধবধির**—চক্ষুতে দেখি না, কানে শুনি না। **হস্ত হালে**—লিখিতে গেলে হাত কাঁপে। **মনোবুদ্ধি ইত্যাদি**—আমার মন স্থির নহে (চঞ্চল), বুদ্ধিও স্থির নহে; কোনও বিষয়ে চিন্তা করিয়া কিছু স্থির করার শক্তি আমার নাই। **নানারোগে গ্রস্ত**—নানাবিধ ব্যাধি আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

চলিতে-বসিতে না পারি—আমি হাটিতে পারি না, স্থির হইয়া বসিতেও পারি না—(রুগ্ন ও বৃদ্ধ বলিয়া)। **পঞ্চরোগের**—বহুবিধ রোগের। পঞ্চশব্দ এস্থলে বহুত্ব-সূচক, যেমন "পাঁচরকম কথা—নানাবিধ কথা।" "পঞ্চরোগের" স্থলে "পঞ্চক্লেশের" পাঠান্তর আছে। **পঞ্চক্লেশ**—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ।

পূর্ব্বগ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন।
তথাপি লিখিয়ে, শুন ইহার কারণ—॥ ৮৬
শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত (আর) শ্রীশ্রোতাবৃন্দ ॥ ৮৭
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীব চরণ ॥ ৮৮
ইঁহাসভার চরণকৃপায় লেখায় আমারে।
আর এক হয়—তেঁহো অতি কৃপা করে ॥ ৮৯
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না জুয়ায়, তভু রহিতে না পারি ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইহাদ্বারা গ্রন্থকার জানাইতেছেন যে, বার্দ্ধক্যাদিবশতঃ তাঁহার শরীর যেমন অশক্ত, অবিদ্যাদিবশতঃ তাঁহার মনও তদ্রূপ লীলাবর্ণনের অযোগ্য।

৮৬। **পূর্ব্বগ্রন্থে**—মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। **ইহা**—আমার বার্দ্ধক্য ও রোগের কথা। **তথাপি লিখিয়ে**—বৃদ্ধ ও রোগকাতর হইয়াও কেন এই গ্রন্থ লিখিতেছি, তাহার কারণ বলিতেছি (পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে)।

৮৮। **শ্রীস্বরূপ**—শ্রীস্বরূপ-দামোদর। তাঁহার কড়চা অবলম্বনে কবিরাজ গোস্বামী অনেক লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। **শ্রীরঘুনাথ** ইত্যাদি—এস্থলে কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার শ্রীগুরুদেবের (দীক্ষাগুরুর) উল্লেখ করিতেছেন। "শ্রীগুরু"-শব্দের অন্বয় কি "শ্রীরঘুনাথের" সঙ্গে হইবে, না কি "শ্রীরূপের" সঙ্গে হইবে, এই পয়ার হইতে তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় না। পরবর্ত্তী ৩।২০।১৩৬ পয়ারে তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন—"শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীব চরণ।" সুতরাং আলোচ্য পয়ারে "শ্রীরঘুনাথের" সঙ্গেই যে "শ্রীগুরু"-শব্দের অন্বয় হইবে, ৩।২০।১৩৬ পয়ার হইতেই বুঝা যায়; শ্রীরঘুনাথই কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু। ৩।১।১৫ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৯। **ইঁহা সভার**—শ্রীগোবিন্দ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীভক্তবৃন্দ, শ্রীচরিতামৃতের শ্রোতাগণ, শ্রীরূপসনাতনাদি ছয় গোস্বামী, ইঁহাদের শ্রীচরণ-কৃপার শক্তিই আমাদ্বারা এই গ্রন্থ লিখাইতেছেন।

আর এক হয়—এতদ্ব্যতীত আরও একজন আছেন, যিনি আমাকে অত্যন্ত কৃপা করেন (তিনি শ্রীমদন-মোহন, পর পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে)।

৯০। শ্রীমন্ মদনগোপাল আদেশ দিয়া আমাদ্বারা এই গ্রন্থ লিখাইতেছেন। ইহা প্রকাশ করিয়া বলা সঙ্গত নহে, তথাপি না বলিয়া থাকিতে পারি না। **কহিতে না জুয়ায়**—বলিলে দাম্ভিকতা প্রকাশ পাইবে বলিয়া বলা সঙ্গত নয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষলীলা বর্ণনের নিমিত্ত কবিরাজ-গোস্বামী যখন বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীমন্ মদনগোপালের মন্দিরে যাইয়া মদনগোপালের আদেশ প্রার্থনা করিলে তাঁহার কণ্ঠস্থিত পুষ্পমালা তাঁহার চরণে পতিত হইয়াছিল। পূজারী আনিয়া সেই মালা কবিরাজ-গোস্বামীর কণ্ঠে দিলেন। কবিরাজ মনে করিলেন, মদনগোপালের কৃপাদেশই মালারূপে তাঁহার বক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ১।৮।২৯-৭২ পয়ার দ্রষ্টব্য।

অন্যত্রও কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন। আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥ সেই লিখি মদনগোপাল যে লিখায়। কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়॥ ১।৮।৭৩-৭৪॥" গৃহস্থ তাহার পালিত শুক পাখীকে যাহা শিখাইয়া দেয়, পাখী তাহাই বলে; তাহাতে পাখীর কর্ত্তৃত্ব বা কৃতিত্ব কিছুই নাই। যাহারা পুতুল নাচায়, তাহারা সুতার সাহায্যে পুতুলকে আকর্ষণ করিয়া যে ভাবে নাচায়, পুতুলও সেই ভাবেই নাচে; ইহাতে পুতুলের কর্ত্তৃত্ব বা কৃতিত্ব কিছুই নাই। কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন—"গ্রন্থ লিখনে আমারও তদ্রূপ কর্ত্তৃত্ব বা কৃতিত্ব কিছুই নাই। শ্রীমদনগোপাল আজ্ঞামালা দিয়া আমাকে যেন তাঁহার লিপিকর (লেখক)-রূপেই নিয়োজিত করিয়াছেন। তারপর, আমাদ্বারা তিনি যাহা লিখাইতেছেন, আমিও তাহাই লিখিতেছি;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যে ভাবে লিখাইতেছেন, সেই ভাবেই আমিও লিখিতেছি।" শ্রীমদনগোপাল অবশ্য শ্রুতিগোচর ভাবে মুখে কিছু বলিয়া যান নাই; ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া ভগবান্ যেমন তাঁহাকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, শ্রীমদনগোপালও যাহা লিখিতে হইবে, তাহা কবিরাজ-গোস্বামীর হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া তাঁহাদ্বারা লেখাইয়া লইয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের আদেশেই যে কবিরাজ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা তো তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন (আদি ৮ম পরিচ্ছেদ); সুতরাং শুকপাখীর বা পুতুলের ন্যায় তিনি একেবারে কর্তৃত্বশূন্য, একথা বলার তাৎপর্য্য কি?

সবই সত্য। তবে তাহার তাৎপর্য্য এই। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শেষলীলা বর্ণনের জন্য বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ যে কবিরাজ-গোস্বামীকে আদেশ করিয়াছেন, তাহা সত্য এবং গ্রন্থ-লিখন-বিষয়ে কবিরাজ যে মদনগোপালের আজ্ঞা ভিক্ষা করিয়াছেন, তাহাও সত্য। আবার মদনগোপালই যে কবিরাজের দ্বারা গৌরের লীলা বর্ণন করাইয়াছেন, তাহাও সত্য। গৌরের শেষলীলা বর্ণনের জন্য মদনগোপালেরই যেন অত্যন্ত আগ্রহ। এই আগ্রহ-বশতঃই তিনি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের চিত্তে প্রেরণা জাগাইয়া কবিরাজ-গোস্বামীকে গ্রন্থ রচনার আদেশ দেওয়াইয়াছেন। তাঁহার প্রেরণা না হইলে—বৃদ্ধ, জরাতুর, দৃষ্টিশক্তিহীন, শ্রবণ-শক্তিহীন, লিখিতে অশক্ত, বার্দ্ধক্য-বশতঃ বিচারে অশক্ত—কবিরাজ-গোস্বামীকে তাঁহারা এইরূপ আদেশ করিবেন কেন? আদেশ দেওয়াইয়া মদনগোপালই আবার তাঁহার নিজের আদেশ ভিক্ষার জন্য কবিরাজের চিত্তে প্রেরণা জাগাইলেন, মালারূপে আদেশও দিলেন; ভঙ্গীতে জানাইলেন—"তোমার অক্ষমতার জন্য তুমি চিন্তিত হইও না, যাহা করিবার আমিই সব করিব; তুমি কেবল লেখনী ধরিয়া থাকিবে, লেখনীও আমিই চালাইব; কি লিখিতে হইবে, তাহাও আমিই তোমার চিত্তে প্রকাশ করিব।"

কিন্তু গৌরলীলা প্রচারের জন্য মদনগোপালের এত আগ্রহ কেন? তিনি পরম-করুণ বলিয়া, "জীব নিস্তারিব এই" তাঁহার "স্বভাব" বলিয়াই এত আগ্রহ।

গত দ্বাপরে শ্রীমদনগোপাল যে এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রজলীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহার একটী উদ্দেশ্য ছিল—জীবকে স্বীয় সেবা দিয়া স্বীয় লীলারস-মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার। দ্বাপর-লীলায় তাঁহার এই উদ্দেশ্য পূর্ণ সাফল্য লাভ করে নাই; "মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ"—ইত্যাদি বাক্যে রাগমার্গের ভজনের উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু সেই উপদেশের বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই; কেবল সূত্রাকারে উল্লেখ করিয়াছেন। আবার সূত্রাকারে ভজনের উপদেশই দিয়াছেন; কিন্তু তাহার কোনও আদর্শও স্থাপন করেন নাই। ব্রজলীলা অন্তর্দ্ধান করার পরে গোলোকে বসিয়া তিনি নিজেই যেন এসব বিষয়ে ভাবিয়াছেন এবং স্থির করিয়াছেন—এবার যাইয়া "আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥ আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥ ১।৩।১৮-৯॥" আরও যেন ভাবিলেন—"শিখাইব, ভজনের আদর্শ স্থাপন করিব। কিন্তু কেবল ভজন-শিক্ষাতেই কি মায়ামুগ্ধ জীব লুব্ধ হইবে? আমি এবার গিয়া ব্রহ্মাদিরও সুদুর্ল্লভ ব্রজপ্রেমই দিব—সাধন-ভজনাদির অপেক্ষা না রাখিয়া আপামর সাধারণকে অমনিই তাহা দিব। 'চির কাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান। ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥' এই প্রেমভক্তি বিতরণের জন্য যেন তাঁহার এতই উৎকণ্ঠা হইল যে, কি ভাবে জগতে আসিলে প্রেমভক্তি দেওয়া যায়, এবং ভজনের আদর্শও স্থাপন করা যায়, তাহাও তিনি চিন্তা করিলেন। তিনি কি যুগাবতার-রূপেই আসিবেন? না কি স্বয়ং রূপেই আসিবেন? স্বয়ং রূপে আসিলে কি শ্যামসুন্দর বংশীবদনরূপে আসিবেন? না কি "রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে এক রূপেই" আসিবেন? না, যুগাবতার-রূপে আসিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যুগাবতার যুগধর্ম্ম নাম অবশ্য প্রচার করিতে পারিবেন, কিন্তু ব্রজপ্রেম তো দিতে পারিবেন না? "যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥" "আমি স্বয়ংরূপেই যাইব। কিন্তু শ্যামসুন্দর বংশীবদনরূপে

না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা-দোষ।
দম্ভ করি বলি শ্রোতা ! না করিহ রোষ ॥ ৯১

তোমাসভার চরণধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে-কিছু লিখন ॥ ৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গেলেও আমার অভীষ্ট সম্যক্ সিদ্ধ হইবে না। শ্যামসুন্দর-রূপে আমার মধ্যে তো অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডার নাই ? অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডার নিয়া না গেলে যাহাকে-তাহাকে নির্বিচারে উজ্জ্বলরসময় প্রেম পর্য্যন্ত দিব কি রূপে ? আমার গৌর-স্বরূপে—রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপেই—শ্রীরাধার অখণ্ড-প্রেম-ভাণ্ডার অবস্থিত। এইরূপেই আমি যাইব। "তথি লাগি পীতবর্ণে চৈতন্যাবতার ॥" এই রূপে যাওয়ার আর একটী সুবিধা এই যে—এই রূপে আমার ভক্তভাব ; তাই ভজনের আদর্শও আমি স্থাপন করিতে পারিব।

শ্যামসুন্দর বংশীবদনরূপে দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়া আমি সূত্রাকারে রাগমার্গের ভজনের কথা বলিয়াছি এবং সেই ভজনের ফলে আমাকে পাইলে যে লীলারস-সমুদ্রে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হওয়া যায়, তাহার কথামাত্র জীবকে শুনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি—যেন সে সকল কথা শুনিয়া জীব ভজনের জন্য লুব্ধ হইতে পারে। "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥" কিন্তু কেবল শুনিয়াই কি লোক প্রলুব্ধ হইবে ? গৌররূপে গেলে লোভনীয় বস্তুটীর চিত্রও সমুজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত করিতে পারিব—যাহা দেখিয়া জীব প্রলুব্ধ হইতে পারে। গৌররূপে আমি আমার নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাইয়া থাক, সেই আনন্দের উন্মাদনায় আমার যে যে অদ্ভুত অবস্থা হয়, তাহা স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করে : বহুলোকে তাহা দেখিতে পাইবে। রাধাপ্রেমের কি অপূর্ব্ব মহিমা, তাহাও আমার গৌরস্বরূপের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। গৌররূপে গেলে তাহাও অনেক লোক দেখিতে পাইবে। দেখিয়া প্রলুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবে না। দ্বাপর-লীলায় কোনও ব্রজ-লীলাতো আমি জীবকে দেখাই নাই ; সেই লীলার কথা জীবকে শুনাইবার ব্যবস্থা মাত্র করিয়াছি। এবার কোনও কোনও লীলার অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় প্রকাশ জীবকে দেখাইব।"

এই সমস্ত ভাবিয়া পরম-করুণ মদন-গোপাল গৌর-রূপেই কলিতে অবতীর্ণ হইয়া অশেষবিধ লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, নিজে ভজন করিয়া এবং স্বীয় পার্ষদদের দ্বারা ভজন করাইয়া ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, গম্ভীরা-লীলাদিতে প্রেমের অপূর্ব্ব বিকাশকে মূর্ত্ত করিয়া দিয়াছেন এবং গোস্বামিপাদগণের দ্বারা রাগমার্গের ভজনের বিস্তৃত বিবরণও প্রচার করাইয়াছেন। এই সমস্তই করিয়াছেন স্বয়ং মদনগোপালই—তাঁহার গৌরস্বরূপে। যতদিন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রকট ছিলেন, ততদিন সকলেই প্রেমভক্তি পাইয়া ধন্য হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের জীব কি শ্রীশ্রীগৌরের অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় কৃপা এবং তাঁহার দান হইতে বঞ্চিত হইবে ? তাহারাও সকলে যেন গৌরের অদ্ভুত চরিত-কথা শুনিয়া এবং তাঁহার উপদিষ্ট ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে—ইহাই মদনগোপালের একান্ত ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছাই গৌর-কথা প্রচারের জন্য তাঁহার আগ্রহ জাগাইয়াছে এবং কবিরাজগোস্বামীর দ্বারা গৌর-চরিত প্রচার করাইয়াছে। মদনগোপালের এইরূপ কৃপা না হইলে গৌরের অন্তর্দ্ধানের পরবর্ত্তী কালের লোক গৌরলীলার কথা—গৌরের উপদেশের কথা কিরূপে জানিত ?

৯১। **কৃতঘ্নতা-দোষ**—অকৃতজ্ঞতারূপ দোষ ; উপকার অস্বীকার করার দোষ।

দম্ভ করি ইত্যাদি—শ্রীমন্মদনগোপালের কৃপার কথা না বলিলে আমার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে ; বলিলেও আমার দম্ভ প্রকাশ পাইবে ; তথাপি, দম্ভ প্রকাশ পাইলেও দাম্ভিকতার জন্য শ্রোতা যেন রুষ্ট না হয়েন।

বাস্তবিক দাম্ভিকতা প্রকাশের জন্য কবিরাজ-গোস্বামী মদন-গোপালের কৃপার কথা জানাইতেছেন না ; মদন-গোপালের কৃপালুতার কথা প্রকাশ করিবার লোভ তিনি সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না, তাই প্রকাশ করিলেন।

৯২। **তোমাসভার**—শ্রোতৃবৃন্দের। **তাতে**—শ্রোতৃবৃন্দের চরণধূলির কৃপায়।

এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে পাই লীলার আস্বাদ ॥ ৯৩
প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন।
তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান-শ্রবণ ॥ ৯৪
তার মধ্যে শিবানন্দসঙ্গে কুক্কুর যে আইলা।
প্রভু তারে 'কৃষ্ণ' কহাইয়া মুক্ত কৈলা ॥ ৯৫
দ্বিতীয়ে ছোটহরিদাসে করাইলা শিক্ষণ।
তাহি-মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য্য-দর্শন ॥ ৯৬
তৃতীয়ে শ্রীহরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত প্রভুরে কৈল বাক্যদণ্ড ॥ ৯৭
প্রভু 'নাম' দিয়া কৈল ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
হরিদাস কৈল নামের মহিমা স্থাপন ॥ ৯৮
চতুর্থে শ্রীসনাতনের দ্বিতীয় মিলন।
দেহত্যাগ হৈতে তাঁরে করিল রক্ষণ ॥ ৯৯
জ্যৈষ্ঠমাসের ঘামে তাঁরে কৈল পরীক্ষণ।
শক্তি সঞ্চারিয়া তাঁরে পাঠাইল বৃন্দাবন ॥ ১০০
পঞ্চমে প্রদ্যুম্নমিশ্রে প্রভু কৃপা কৈল।
রায়ের দ্বারে তাঁরে কৃষ্ণকথা শুনাইল ॥ ১০১
তারি মধ্যে বাঙ্গাল-কবির নাটক-উপেক্ষণ।
স্বরূপগোসাঞিকৈলা বিগ্রহমহিমা-স্থাপন॥ ১০২
ষষ্ঠে রঘুনাথ দাস প্রভুরে মিলিলা।
নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিড়ামহোৎসব কৈলা ॥ ১০৩
দামোদরস্বরূপ-ঠাঞি তারে সমর্পিলা।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জমালা তারে দিলা ॥ ১০৪
সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের মিলন।
নানা মতে কৈল তার গর্ব্বখণ্ডন ॥ ১০৫
অষ্টমে রামচন্দ্রপুরীর আগমন।
তার ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা-সঙ্কোচন ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই পয়ারে কবিরাজ গোস্বামীর অভিপ্রায় বোধ হয় এই—ভক্ত-শ্রোতৃবৃন্দকে গৌরলীলারূপ অমৃত পান করাইবার উদ্দেশ্যেই ভক্তবৎসল শ্রীমন্ মদনগোপাল তাঁহাদ্বারা এই গ্রন্থ লিখাইয়াছেন; সুতরাং শ্রোতৃভক্তবৃন্দই এই গ্রন্থলিখনের হেতু; তাই তাঁহাদের চরণে তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

৯৩। **এবে**—গ্রন্থ শেষ করিয়া এক্ষণে। **অন্ত্যলীলাগণের**—গ্রন্থের অন্ত্যলীলায় প্রভুর যে সমস্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের; অন্ত্যলীলার পরিচ্ছেদসমূহে বর্ণিত লীলাসমূহের। **অনুবাদ**—বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ। **অনুবাদ কৈলে**—বর্ণিত বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিলে।

ইহার পরে, অন্ত্যলীলায় কোন্ পরিচ্ছেদে কি বর্ণনা করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছেন।

৯৪। **রূপের দ্বিতীয় মিলন**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপ-গোস্বামীর দ্বিতীয়বার মিলন (নীলাচলে); প্রথম মিলন, প্রয়াগে।

তার মধ্যে—প্রথম পরিচ্ছেদে, দ্বিতীয় মিলন-প্রসঙ্গে। **দুই নাটকের**—শ্রীরূপ প্রণীত ললিতমাধব এবং বিদগ্ধমাধব নামক নাটক-গ্রন্থদ্বয়ের।

৯৫। **তার মধ্যে**—প্রথম পরিচ্ছেদের মধ্যে।

৯৬। **দ্বিতীয়ে**—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। **তাহি মধ্যে**—সেই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই। **আশ্চর্য্য দর্শন**—শিবানন্দের বাড়ীতে শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী পাক করিয়া প্রভুর ভোগ লাগাইয়া ধ্যান করিলে প্রভুর সে স্থানে আবির্ভাবাদি।

৯৯। **সনাতনের দ্বিতীয় মিলন**—নীলাচলে; প্রথম মিলন বারাণসীতে।

১০০। **ঘামে**—রৌদ্রে। "ধূপে" পাঠান্তরও আছে। ধূপে—রৌদ্রে।

তারে—সনাতন গোস্বামীকে।

১০১। **রায়ের দ্বারে**—রায়-রামানন্দদ্বারা। প্রথম পয়ারার্দ্ধ-স্থলে 'রামানন্দ পাশে কৃষ্ণকথা শুনাইল' পাঠান্তর আছে।

নবমে গোপীনাথপট্টনায়ক-বিমোচন।
ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দরশন॥ ১০৭
দশমে করিল ভক্তদত্ত আস্বাদন।
রাঘবপণ্ডিতের তাহাঁ ঝালির সাজন॥ ১০৮
তাহি-মধ্যে গোবিন্দের কৈল পরীক্ষণ।
তাহি-মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্যের বর্ণন॥ ১০৯
একাদশে হরিদাসঠাকুরের নির্য্যাণ।
ভক্তবাৎসল্য যাহাঁ দেখাইল গৌর ভগবান্॥ ১১০
দ্বাদশে জগদানন্দের তৈলভঞ্জন।
নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দের তাড়ন॥ ১১১
ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাঞা আইলা।
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা॥ ১১২
রঘুনাথভট্টাচার্য্যের তাহাঁই মিলন।
প্রভু তারে কৃপা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন॥ ১১৩
চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ-আরম্ভ-বর্ণন।
শরীর এথা প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন॥ ১১৪
তাহি-মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন।
অস্থিসন্ধি-ত্যাগ-অনুভাবের উদ্গম॥ ১১৫
চটকপর্ব্বত দেখি প্রভুর ধাবন।
তাহি-মধ্যে প্রভুর কিছু আলাপবর্ণন॥ ১১৬
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যানবিলাসে।
বৃন্দাবনভ্রমে যাহাঁ করিল প্রবেশে॥ ১১৭
তাহি-মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়-আকর্ষণ।
তাহি-মধ্যে কৈল রাসে কৃষ্ণ অন্বেষণ॥ ১১৮
ষোড়শে কালিদাসে প্রভু কৃপা কৈলা।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইলা॥ ১১৯
শিবানন্দ-বালকেরে শ্লোক করাইল।
সিংহদ্বারের দ্বারী প্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল॥ ১২০
মহাপ্রসাদের তাহাঁ মহিমা বর্ণিল।
কৃষ্ণাধরামৃতের শ্লোক সব আস্বাদিল॥ ১২১
সপ্তদশে গাবীমধ্যে প্রভুর পতন।
কূর্ম্মাকার-অনুভাবের তাহাঁই উদ্গম॥ ১২২
কৃষ্ণের শব্দ-গুণে প্রভুর মন আকর্ষিল।
'কাস্ত্র্যঙ্গতে' শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল॥ ১২৩
ভাব-শাবল্যে পুন কৈল প্রলপন।
কর্ণামৃত-শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ॥ ১২৪
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন।
কৃষ্ণ-গোপী-জলকেলি তাহাঁ দরশন॥ ১২৫
তাহাঁই দেখিল কৃষ্ণের বন্যভোজন।
জালিয়া উঠাইলা, প্রভু আইলা স্ব-ভবন॥ ১২৬
ঊনবিংশে ভিত্ত্যে প্রভুর মুখসঙ্ঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি প্রলাপবর্ণন॥ ১২৭
বসন্ত-রজনী পুষ্পোদ্যানে বিহরণ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য-শ্লোকের অর্থবিবরণ॥ ১২৮
বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পঢ়িয়া।
তার অর্থ আস্বাদিল প্রেমাবিষ্ট হঞা॥ ১২৯
ভক্ত শিখাইতে ক্রমে যে অষ্টক কৈল।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুন আস্বাদিল॥ ১৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৮। **ভক্তদত্ত আস্বাদন**—গৌড়ের ভক্তগণ প্রভুর নিমিত্ত যে সমস্ত দ্রব্য দিয়াছিলেন (দময়ন্তীর ঝালি আদি), তাহা আস্বাদনের কথা।

১০৯। **গোবিন্দের কৈল পরীক্ষণ**—গম্ভীরার দ্বার জুড়িয়া (প্রভু) শুইয়া।

১১১। **তৈল ভঞ্জন**—তৈলের কলস ভাঙ্গা।

শিবানন্দের তাড়ন—শ্রীনিতাই-কর্তৃক শিবানন্দকে লাথি দেওয়া।

১১৪। **এথা**—নীলাচলে।

১১৬। **আলাপ বর্ণন**—"প্রলাপ বর্ণন" পাঠান্তর আছে।

১৩০। **ভক্ত শিখাইতে**—ভক্তগণকে শিক্ষা দিতে। "ভক্ত" স্থলে "ভক্তি" পাঠও আছে; জীবকে ভক্তি শিক্ষা দিতে।

মুখ্যমুখ্য লীলার তাহাঁ করিল কথন।
অনুবাদ হৈতে স্মরে গ্রন্থবিবরণ ॥ ১৩১
একেক পরিচ্ছেদের কথা অনেক প্রকার।
মুখ্যমুখ্য গণিল, শুনিতে জানিব অপার ॥ ১৩২
শ্রীরাধাসহ শ্রীমদনমোহন।
শ্রীরাধাসহ শ্রীগোবিন্দচরণ ॥ ১৩৩
শ্রীরাধাসহ শ্রীগোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর—সব গৌড়িয়ার নাথ ॥ ১৩৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীযুত নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১৩৫
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবচরণ ॥ ১৩৬
নিজশিরে ধরি এই সভার চরণ।
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিতপূরণ ॥ ১৩৭
সভার চরণকৃপা গুরু উপাধ্যায়ী।
মোর বাণী শিষ্যা, তারে বহুত নাচাই ॥ ১৩৮
শিষ্যার শ্রম দেখি গুরু নাচন রাখিল।
কৃপা না নাচায়, বাণী বসিয়া রহিল ॥ ১৩৯
অনিপুণা বাণী—আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রামে ॥ ১৪০
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যা সভার চরণকৃপা শুভের কারণ ॥ ১৪১
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে ॥ ১৪২
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকে ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হয় শ্রম ॥ ১৪৩
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৪৪

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষা-
শ্লোকার্থাস্বাদনং নাম বিংশতি-
পরিচ্ছেদঃ ॥ ২০ ।

—

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

১৩১। **স্মরে**—স্মৃতিপথে উদিত হয়; মনে পড়ে। "স্মরে"-স্থলে "স্ফুরে"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

১৩৬। শ্রীরঘুনাথ যে কবিরাজ গোস্বামীর গুরু, তাহা এস্থলে স্পষ্ট কথাতেই বলা হইয়াছে। ৩।১৯।৯৫ ত্রিপদীর এবং ৩,২০,৮৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩৮। **সভার চরণকৃপা**—শ্রীরাধাসহ শ্রীমদনমোহনাদি সকলের শ্রীচরণকৃপা। **উপাধ্যায়ী**—নৃত্যগীত-বাদ্যাদির সুদক্ষ আচার্য্যাণী। **মোর বাণী**—আমার (গ্রন্থকারের) কথা।

শ্রীরাধা সহ শ্রীমদনমোহনাদির কৃপা নৃত্যগীতাদির আচার্য্যরূপে গ্রন্থকারের কথাকে শিষ্যা করিয়া অনেক প্রকারে নাচাইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদের কৃপাবলেই গ্রন্থকার নিজের কথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাঁহারা কৃপা করিয়া যাহা লিখাইয়াছেন, তিনিও তাহাই লিখিয়াছেন।

১৪০। **অনিপুণা**—অপটু, নিজে নাচিতে অক্ষমা।

১৪৪। **শ্রীরূপ-রঘুনাথ** ইত্যাদি। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী অন্যত্র বলিয়াছেন—"শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥ এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার। ১।১।১৮-১৯॥" কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার ছয়জন শিক্ষাগুরুর নাম উল্লেখ প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীরূপগোস্বামীর এবং সর্ব্বশেষে শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামীর নামের উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচ্য এই পয়ারে, "শ্রীরূপ রঘুনাথ"-বাক্যে উল্লিখিত ছয় গোস্বামীর নামের প্রথম নাম (শ্রীরূপ) এবং সর্ব্বশেষ নাম (রঘুনাথ) উল্লেখ করিয়াই উপলক্ষণে তিনি ছয় গোস্বামীর কথাই বলিয়াছেন।

অথবা অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। শ্রীরূপাদি ছয় গোস্বামীর সকলেই কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরু হইলেও তাঁহার উক্তি হইতে জানা যায়—শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ও শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামীর সহিত তাঁহার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যেন একটা বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরস-প্রান্ত॥ ১।৫।১৮১॥" এবং "সেই রঘুনাথদাস প্রভু যে আমার॥ ১।১০।১০১॥" অবশ্য তিনি ইহাও লিখিয়াছেন—"সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত। ১।৫।১৮১॥" শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর সহিতও তাঁহার একটি বিশেষ সম্বন্ধ ছিল; শ্রীপাদ সনাতনের কৃপায় তিনি "ভক্তির সিদ্ধান্ত" পাইয়াছেন; কিন্তু শ্রীপাদ রূপের কৃপাতে তিনি "ভক্তিরস প্রান্ত" পাইয়াছেন। "ভক্তি-সিদ্ধান্তের" পরম-পর্য্যবসানই হইল "ভক্তিরস প্রান্তের" প্রাপ্তিতে; সুতরাং ভক্তিসিদ্ধান্ত অপেক্ষা ভক্তিরস-প্রান্তের উৎকর্ষও আছে; তাই মনে হয়—শ্রীপাদ রূপ এবং শ্রীপাদ সনাতন এতদুভয়ের সঙ্গেই কবিরাজ গোস্বামীর একটা বিশেষ সম্বন্ধ থাকিলেও "ভক্তিসিদ্ধান্ত"-জ্ঞাপয়িতা শ্রীপাদ সনাতন অপেক্ষা "ভক্তিরস-প্রান্ত"-দাতা শ্রীপাদরূপের সহিত তাঁহার সম্বন্ধেরও একটা উৎকর্ষ বা বৈশিষ্ট্য আছে। আর শ্রীপাদ রঘুনাথদাসগোস্বামী "প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥ ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন। ১।১০।৯০-৯১॥" শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া এই ষোল বৎসর পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সমস্ত লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী সে সমস্তের প্রত্যক্ষদর্শী এবং আস্বাদক। এ সমস্তের বিস্তৃত বিবরণ কবিরাজগোস্বামী দাসগোস্বামীর নিকট হইতে পাইয়াই আস্বাদনও করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্টও করিয়াছেন। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে শ্রীলদাসগোস্বামীর সহিতও কবিরাজ গোস্বামীর সম্বন্ধের একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌরলীলারস এবং কৃষ্ণলীলারস—এই উভয় লীলারসের দ্বারাই পরিনিষিক্ত। শ্রীরূপ এবং শ্রীরঘুনাথদাস এই দুই জনের কৃপায় প্রাপ্ত রস-সম্ভারই কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থে ছড়াইয়া দিয়াছেন। তাই তিনি প্রায় প্রতি পরিচ্ছেদের অন্তেই লিখিয়াছেন—"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥" এইরূপ অর্থ গৃহীত হওয়ার যোগ্য হইলে এই পয়ারে "শ্রীরূপ রঘুনাথ" বাক্যে কেবল শ্রীরূপগোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অন্যরূপও হইতে পারে। পূর্ব্বে (৩।১৯।৯৫ ত্রিপদীর টীকায়) বলা হইয়াছে—বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীলরঘুনাথভট্ট গোস্বামী ছিলেন কবিরাজগোস্বামীর দীক্ষাগুরু এবং শ্রীলরূপগোস্বামী ছিলেন তাঁহার পরম গুরু; সুতরাং এই দুই জনের সহিত কবিরাজগোস্বামীর সম্বন্ধ ছিল পরম-বৈশিষ্ট্যময়। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে মনে করা যাইতে পারে,—"শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।"-ইত্যাদি পয়ারে কবিরাজগোস্বামী স্বীয় শ্রীগুরুদেবের এবং শ্রীপরমগুরুদেবের চরণই স্মরণ করিয়াছেন। এইরূপ অর্থে পয়ারস্থ "রঘুনাথ" শব্দে শ্রীল রঘুনাথভট্টগোস্বামীকেই বুঝাইবে।

অন্ত্য-লীলা সমাপ্তা।

॥ ০ ॥ সমাপ্তমিদং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ০ ॥

॥ ০ ॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু ॥ ০ ॥

অন্ত্য-লীলা

উপসংহার-শ্লোকাঃ

চরিতমমৃতমেতৎ শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ
শুভদমশুভনাশি শ্রদ্ধয়াস্বাদয়েদ্ যঃ।
তদমলপাদপদ্মে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ং
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেমমাধ্বীকপূরম্ ॥ ক ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী উপসংহার-শ্লোকগুলিতে এই গ্রন্থের আস্বাদনের মাহাত্ম্য, গ্রন্থকারের ইষ্টদেবে গ্রন্থার্পণ এবং গ্রন্থসমাপ্তির সময়ের কথা বলিয়াছেন। মোট শ্লোক চারিটী। শেষ শ্লোকটী গ্রন্থসমাপ্তির সময় সম্বন্ধে। কোনও কোনও গ্রন্থে প্রথম তিনটী শ্লোক নাই। গ্রন্থসমাপ্তির সময়বিষয়ক শেষ শ্লোকটীমাত্র আছে,—তাহাও আবার অন্ত্যলীলার বিংশপরিচ্ছেদের সর্ব্বশেষ পয়ারের শেষে।

শ্লো। ক। **অন্বয়।** শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ (বিভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) শুভদং (মঙ্গলপ্রদ) অশুভনাশি (এবং অমঙ্গলনাশক) এতৎ (এই) চরিতামৃতং (চরিতামৃত) যঃ (যিনি) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) আস্বাদয়েৎ (আস্বাদন করেন) সঃ অয়ং (তিনি) তদমলপাদপদ্মে (তাঁহার অমলপাদপদ্মে) ভৃঙ্গতাম্ এত্য (ভৃঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়া—ভৃঙ্গ হইয়া) প্রেমমাধ্বীকপূরং (প্রেমমাধ্বীকপূর্ণ) রসং (রস) উচ্চৈঃ (প্রভূত পরিমাণে) রসয়তি (আস্বাদন করেন)।

অনুবাদ। বিভু-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মঙ্গল-প্রদ ও অমঙ্গল-নাশক এই চরিতামৃত যিনি শ্রদ্ধার সহিত আস্বাদন করেন, তিনি তাঁহার অমলপাদপদ্মে ভৃঙ্গ হইয়া প্রভূত পরিমাণে প্রেমমাধ্বীকরস আস্বাদন করেন। ক

শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ- শ্রীচৈতন্যরূপ বিষ্ণুর (বা বিভুবস্তুর); শ্রীচৈতন্য যে জীব নহেন, পরন্তু তিনি যে সর্ব্বব্যাপক—অনন্ত, বিভু, ব্রহ্মবস্তু, তাহাই সূচিত হইতেছে "বিষ্ণু"-শব্দদ্বারা। **তদমলপাদপদ্মে**- তাঁহার (শ্রীচৈতন্যদেবের) অমল (সুবিমল) পাদ (চরণ) রূপ পদ্মে, চরণকমলে। পদ্মে যেমন মধু থাকে, শ্রীচৈতন্যদেবের চরণেও মধু আছে তাঁহার চরণসেবার আনন্দই এই মধু। **প্রেমমাধ্বীকপূরং রসম্**-- মাধ্বীকম্ মধুকপুষ্পকৃতমদ্যম্ (শব্দকল্পদ্রুম); মধুক-পুষ্প হইতে জাত মদ্যকে মাধ্বীক বলে; পূর—পূর্ণ। প্রেমরূপ যে মাধ্বীক তদ্দ্বারা পূর্ণ যে রস, তাহা। কৃষ্ণপ্রেমরসসুধা।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ব্রহ্মবস্তু—স্বয়ং ভগবান্—হইয়াও লীলারস-আস্বাদনের নিমিত্ত এবং রসাস্বাদনের আনুষঙ্গিক ভাবে জগতের জীবকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করিয়াছেন; সেই লীলারই কিছু অংশ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে। এই চরিতামৃত বস্তুতঃ অমৃতের ন্যায়ই—বরং অমৃত অপেক্ষাও—আস্বাদ্য; যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত এই চরিতামৃত আস্বাদন করিবেন, তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণসেবা লাভ করিতে পারিবেন—ভৃঙ্গ যেমন পদ্মের মধু পান করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়ে, তিনিও তদ্রূপ শ্রীশ্রীগৌরের চরণ সেবাজনিত অমল আনন্দের আস্বাদনে প্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়িবেন এবং তখন তাঁহারই কৃপায় তিনি কৃষ্ণপ্রেমরসসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে পারিবেন। অপর এক স্থলেও গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী চরিতামৃত-আলোচনার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেনঃ—"যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহো, কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত। কৃষ্ণে

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতৎ চৈতন্যচরিতামৃতম্॥ খ॥

পরিমলবাসিতভুবনং স্বরসোন্মাদিতরসজ্ঞরোলম্বম্।
গিরিধরচরণাম্ভোজং কঃ খলু রসিকঃ সমীহতে হাতুম্॥ গ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি, শুনিলেই হইবে বড় হিত॥ ২।২।৭৪॥" তাই তিনি আর এক স্থলে বলিয়াছেন—"শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা। চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্। ৩।১২।১ শ্লোক॥"

এই শ্লোকে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আলোচনার মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে।

শ্লো। খ। অন্বয়। চৈতন্যার্পিতং (শ্রীচৈতন্যদেবে অর্পিত) এতৎ (এই) চৈতন্যচরিতম্ (শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ) শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেবতুষ্টয়ে (শ্রীমন্মদনগোপালের এবং শ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টির নিমিত্ত) অস্তু (হউক)।

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যে অর্পিত এই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ শ্রীমন্মদনগোপালের এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টির নিমিত্ত হউক। খ

বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দের আদেশেই কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীশ্রী-গোবিন্দদেবের ও শ্রীশ্রীমদনগোপালের কৃপা প্রার্থনা করেন; তাঁহাদের কৃপায় তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, লিখিয়া তাহা তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে অর্পণ করেন; তাহাতেই যেন শ্রীশ্রীমদনগোপাল ও শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব তুষ্ট হয়েন—ইহাই তিনি প্রার্থনা করিতেছেন। প্রকট-লীলার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দেখাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রীমদনগোপাল বা শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে আত্মপ্রকট করিয়া এই গ্রন্থের বর্ণিত লীলাসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন। এ সমস্ত লীলার বর্ণনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় শ্রীশ্রীমদনগোপাল বা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেরও তুষ্টি; যেহেতু, এসমস্ত লীলা তাঁহাদেরই লীলা, তাঁহাদেরই রস-বৈচিত্রী আস্বাদনের বিবৃতি—তাই তাঁহাদের তুষ্টির উপকরণ। ৩।২০।৯০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে গ্রন্থকার স্বীয় ইষ্টদেবের চরণে গ্রন্থার্পণ করিলেন।

শ্লো। গ। অন্বয়। পরিমলবাসিতভুবনং (যাহা স্বীয় পরিমলদ্বারা সমস্ত ভুবনকে সুবাসিত করে), স্বরসোন্মাদিত-রসজ্ঞরোলম্বম্ (যাহা স্বীয় মাধুর্য্যদ্বারা রসজ্ঞ ভ্রমরবৃন্দকে উন্মাদিত করে) গিরিধরচরণাম্ভোজং (গিরিধরের সেই চরণকমল) হাতুং (ত্যাগ করিতে) কঃ (কোন্) রসিকঃ (রসিক ভক্ত) সমীহতে খলু (ইচ্ছা করেন)?

অনুবাদ। যাহা স্বীয় পরিমলদ্বারা সমস্ত ভুবনকে সুবাসিত করে, যাহা স্বীয় মাধুর্য্যদ্বারা রসজ্ঞ ভ্রমরবৃন্দকে উন্মাদিত করে, গিরিধরের সেই চরণকমলকে কোন্ রসিক ভক্ত ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন? (অর্থাৎ কেহই ইচ্ছা করেন না)। গ

গিরিধরের—গোবর্দ্ধনধারী-শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীমদনগোপালদেবের বা শ্রীগোবিন্দদেবের চরণকমল কোনও রসিক-ভক্তই ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন, সমর্থও নহেন। কিরূপ সেই চরণ কমল? **পরিমলবাসিতভুবনম্**—যাহার পরিমলের (সুগন্ধের) দ্বারা বাসিত (সুবাসিত) হইয়াছে ভুবন (জগৎ); যাহার সুগন্ধে সমস্ত জগৎ সুবাসিত হইয়াছে, তাদৃশ চরণকমল। কমলের সুগন্ধে যেমন নিকটবর্ত্তী স্থান আমোদিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণরূপ কমলের (সেবাসুখরূপ) সুগন্ধেও সমস্ত জগৎ (জগদ্বাসী সমস্ত লোক) কৃতার্থ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণচরণের মহিমায় সমগ্র জগৎ কৃতার্থ। আর কিরূপ? **স্বরসোন্মাদিতরসজ্ঞরোলম্বম্**—স্বীয় রসের দ্বারা উন্মাদিত করে রসজ্ঞরূপ রোলম্ব (বা ভ্রমর)-গণকে যাহা; যে চরণকমল স্বীয় রসের (মধুর) দ্বারা রসিকভক্তরূপ ভ্রমরগণকে উন্মাদিত করে; যে চরণের সেবাসুখ আস্বাদন করিয়া ভক্তগণ প্রেমোন্মত্ত হয় এবং যে চরণকমলের সেবাসুখ-আস্বাদনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠাতেও রসিকভক্তগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়েন।

শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। | সূর্য্যেঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥ঘ।

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীমদন-গোপাল-গোবিন্দদেবের তুষ্টির কথা বলিয়া এই শ্লোকে সেই তুষ্টির হেতু বলিতেছেন। গোবিন্দদেবের তুষ্টির উদ্দেশ্য—তাঁহার কৃপায় তাঁহার চরণসেবাপ্রাপ্তি; চরণ-সেবার জন্য লোভের হেতু এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—পরিমলবাসিতভুবনম্ এবং স্বরসোন্মাদিতরসজ্জরোলম্বম্—এই দুই পদে। অথবা, গ্রন্থকারের অন্যতম শিক্ষাগুরু শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর সেবিত শ্রীশ্রীগিরিধারী বিগ্রহের চরণসেবার মাহাত্ম্যই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়া থাকিবে। শ্রীমদনগোপাল, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগিরিধর—একই শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের বিভিন্ন নাম এবং এই তিন বিভিন্ন নামের বাচ্য তিন বিগ্রহও একই শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের বিভিন্ন প্রকাশ। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন নাম উল্লিখিত হইলেও মূল লক্ষ্য ব্রজেন্দ্রনন্দনই।

শ্লো। ঘ। অন্বয়। সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ (পনর শত সাঁইত্রিশ) শাকে (শকাব্দায়) জ্যৈষ্ঠে (জ্যৈষ্ঠ মাসে) সূর্য্যে অহ্নি (রবিবারে) অসিতপঞ্চম্যাং (কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে) বৃন্দাবনান্তরে (শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে) অয়ং গ্রন্থঃ (এই গ্রন্থ—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ) পূর্ণতাং গতঃ (পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল—সম্পূর্ণ হইল)।

অনুবাদ। ১৫৩৭ শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণাপঞ্চমীতিথিতে রবিবারে এই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল (অর্থাৎ এই গ্রন্থের লিখন সমাপ্ত হইল)। ঘ

সিন্ধু-আদি শব্দ এস্থলে সংখ্যাবাচক। **সিন্ধু**—সমুদ্র; সমুদ্র সাতটী আছে বলিয়া সিন্ধুশব্দ যখন সংখ্যাবাচক রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন ৭ সাত বুঝায়। এইরূপে **অগ্নি** শব্দে বুঝায় ৩ তিন, **বাণ**-শব্দে বুঝায় ৫ পাঁচ এবং **ইন্দু**-শব্দে বুঝায় ১ এক। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ"—এই নিয়মানুসারে কোনও রাশিবাচক শব্দে যে সমস্ত সংখ্যার উল্লেখ থাকে, তাহাদের প্রথমটী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বামদিকে লিখিয়া গেলে যে রাশিটী পাওয়া যাইবে, তাহাই হইবে উক্ত রাশিবাচক-শব্দের বাচ্য; এইরূপে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ শব্দে প্রথমে সিন্ধু (৭), তারপরে অগ্নি (৩), তারপরে বাণ (৫) এবং সর্ব্বশেষে ইন্দু (১) আছে বলিয়া ৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বামদিকে লিখিয়া গেলে পাওয়া যায়—১৫৩৭। সিন্ধগ্নিবাণেন্দু শব্দে ১৫৩৭ বুঝায়। এই ১৫৩৭ শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে রবিবারে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের লিখন সমাপ্ত হয়।

কেহ কেহ বলেন ১৫০৩ শকাব্দাতেই গ্রন্থ-সমাপ্তি হইয়াছিল; প্রমাণরূপে তাঁহারা "শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যেঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"-এই শ্লোকের উল্লেখ করেন। কিন্তু এই উক্তি বিচারসহ নহে; ভূমিকায় "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তি-কাল" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের
গৌরকৃপাতরঙ্গিণীটীকা সমাপ্তা ॥

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরার্পণমস্তু

প্রথম সংস্করণের টীকা সমাপ্তির তারিখ ১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৩৩ সন। দ্বিতীয় সংস্করণের টীকা সমাপ্তির তারিখ ১৪ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪০ সন। তৃতীয় সংস্করণের টীকা সমাপ্তির তারিখ ১২ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৫৮ সন।

ভক্তপদরজঃপ্রার্থী শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।